

চেতনা

একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

- অবহেলা যতদিন, সংরক্ষণ ততদিন
- শ্রেণী সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বজায় রেখে এস.সি., এস.টি, ও.বি.সি., সংখ্যালঘু, মহিলাদের অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন
- সাম্রাজ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন
- উন্নয়নের বাহানায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক
- বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu state and Brahminism derived from MANU SANGHITA is still the guiding philosophy of the Indian ruling classes. Until the abolition of the caste system and discrimination based on gender and community there is no chance of the victory of class struggle in whatever form.

Beside taking programmes of rights of Dalits, Women and Minorities (Religious and Linguistics) DAFODWAM is in the area of publication of books on concerned subjects in different languages without support from any foreign / Government(s) fund.

For Correspondence :

ananta acharya
DAFODWAM
30/2, N. P. Road, Kolkata - 700 055
West Bengal, India
Ph : (0) 9331858854

E-mail : dafodwam.dafodwam@gmail.com
chetanalahar@rediffmail.com

Exchange Price : 65/-



বর্ষ - ৪ • যুগ্ম সংখ্যা - জুলাই ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৪

Combined Issue CHETANA LAHAR

Year - 4 No. - 3 & 4

চেতনা

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে

রাজা আসে যায়
রাজা বদলায়
নীল জামা গায়
লাল জামা গায়
এই রাজা আসে
ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
... দিন বদলায় না।
রাজা আসে যায়
আসে আর যায়
গুধু পোশাকের রং বদলায়
গুধু মুখোশের ঢং বদলায়

ধনবাদে নারীদের শোষণ

কার্ল মার্কস

অতিরিক্ত খাটুনির ফলে মৃত্যু

১৮৬৩ জুনের শেষ সপ্তাহে লন্ডনের দৈনিক পত্রিকায় 'অতিরিক্ত খাটুনির ফলে মৃত্যু' শীর্ষক একটি উদ্বেজনাপূর্ণ খবর বের হয়। খবরটি হলো : মহিলাদের পোশাক তৈরির দোকানে কর্মরত একটি ২০ বৎসরের তরুণী, মেরী আনে ওয়াক্লির মৃত্যু ঘটেছে। মেয়েটি কাজ করত একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পোশাক তৈরির দোকানে। দোকানের মালিক এক অভিজাত মহিলা নাম এলিস।

এমন ঘটনা আরো অনেকবার ঘটেছে। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি দৈনিক গড়ে ষোল ঘণ্টা কাজ করত। এই খাটুনি মরশুমের সময় আরো বাড়ত। কখনো কখনো তাকে একটানা ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে যেতে হতো। যখন সে খাটিতে খাটিতে আর পেরে উঠত না, তখন তাকে মাঝে মাঝে পেরি, কফি খাইয়ে চালা করে তোলা হতো। এ সময়টা ছিল সেরা মরশুমের সময়। সম্প্রতি এখানে এসেছেন প্রিন্সেস অব ওয়েলস্। তাঁর সম্মানে বল নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছে। আর সেখানে আমন্ত্রিত অভিজাত মহিলাদের জন্য জাঁকজমক পোশাক নিমেষের মধ্যেই তৈরি করে দিতে হবে।

মেরী আনে ওয়াক্লি, আরো ৬০ জন মেয়ের সঙ্গে একটানা সাড়ে ছাব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেছে। তারা এক একটা ঘরে গ্রিশ জন করে বসেছে। আর এমন ঠাসঠাসি করে বসতে হয়েছে তাদের যে মানুষের জীবনধারণের জন্য অস্বস্ত যতটুকু ঘনফুট বাতাসের প্রয়োজন তারা তার তিন ভাগের একভাগ মাত্র পেতে পারে। রাতে তারা শুভো একটা ঘরের মধ্যে কাঠের পার্টিশান করা এক একটা খুপারীর মধ্যে দু'জন দু'জন করে। আর এটি কিন্তু ছিল লন্ডনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোশাক তৈরির দোকান। মেরী আনে ওয়াক্লি শুক্রবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। রবিবার মারা যায়। দোকানের কনস্ট্রী মাদাম এলিস তো অবাক হয়ে গেলেন। মেয়েটা হাতের কাজটা শেষ না করেই মরে গেল।

যখন ডাঃ মি কিজ-কে ডেকে আনা হলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তিনি

কারোনারের জুরীদের কাছে যথারীতি সাক্ষ্য দিলেন : “এক ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বসে একটানা অতিরিক্ত খাটুনির ফলে ও আলো-বাতাসহীন বন্ধ ঘরে শোবার ফলেই মেরী আনে ওয়াক্লির মৃত্যু হয়েছে।” কিন্তু ডাক্তারকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হলো। কারোনারের জুরীরা রায় দিলেন : “মেরী আনে ওয়াক্লির মৃত্যু হয়েছে সম্ভ্যাস রোগে। তবে ঠাসাঠাসি ঘরে বসে অতিরিক্ত খাটুনির জন্য মৃত্যুটা যে দ্বরাঙ্কিত হয়েছে সে আশঙ্কাও করা যায়।”

অবোধ-বাণিজ্য নীতির প্রবক্তা করডেন এবং ব্রাইট-এর মুখপত্র ‘মর্পিং স্টার’ জোরের সঙ্গে বলল : “আমাদের ক্রীতদাসীরা খাটিতে খাটিতেই কবরের তলায় যাচ্ছে। নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।”

□

নারীর অধিকার—পেরিয়ার

ভাষান্তর : দেবী চ্যাটার্জী

১৭শ বছর আগে (১৯২৯ সালে) চেন্নালপেটে ডব্লিউ. এস. সৌন্দারপাডিয়ানের সম্প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠিত প্রথম আত্মমর্যাদা সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাস হয়েছিল : এই সম্মেলন সিদ্ধান্ত করেছে যে,

“সম্প্রতিষ্ঠিত উত্তরাধিকারের সুবিধাভোগে এবং কোন পেশায় বা কাজে নাট্যনো অধিকারে ও সুযোগ সুবিধায় নারীদের পুরুষের সমান অধিকার থাকবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিদ্যালয়গুলিতে বেশি সংখ্যক মহিলা শিক্ষিকা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”

অন্য আরেকটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ বছরের উপর হতে হবে, যদি স্বামী অথবা স্ত্রী বৃদ্ধনটা অপছন্দ করে এবং বিবাহ বাতিল করতে পারি, স্বামী বা স্ত্রীকে বিবাহ বাতিল করার অধিকার দিতে হবে। বিধবাকে আবার বিবাহ করতে সাহায্য করতে হবে এবং ধর্ম ও জাতের প্রতি কোনও গুরুত্ব আরোপ না করে পুরুষ ও নারীকে তাদের সঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার দিতে হবে।

আত্মমর্যাদা সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই মাদ্রাজে যে সারা ভারত নারী সম্মেলন বসে তার একটি প্রস্তাবে দ্বিতীয় প্রস্তাবকে বিরোধিতা ও নিন্দা করে। সেই সারা ভারত নারী সম্মেলন এখন গত দু’দিন ধরে রাজাজী হলে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে। রাশিয়া, আমেরিকা, রুমানিয়া, সিংহলের মত অনেক দেশের নারী প্রতিনিধিরা সেখানে অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনে সভানেত্রিকারিনী শ্রী রথসা চরণ এই বলে খেদ প্রকাশ করেছেন যে কিছু ভারতীয় নারী বেকার রয়েছেন এবং আরো কিছু ভারতীয় নারী কোনও কাজ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করে বলেছেন যে, হিসাব-নিকাশ, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞাপন, বাণিজ্যিক পরিচালনা, খাদ্য পরিবেশনের মত কিছু বিভাগে এবং গুরুত্বপূর্ণের মত কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার নারী পাওয়া যায় না।

ভারত সরকার প্রতি বছর নারী প্রগতির জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে

রাখে। যেহেতু গোটা টাকটার ব্যবস্থাপনা দু'একজন ব্রাহ্মণ মহিলার হাতে ছেড়ে রাখা হয়, তাই দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণির মহিলারা উপযুক্ত সাহায্য পান না, কিন্তু হাজার হাজার ব্রাহ্মণ মহিলা ২০০/৩০০ টাকা মাসিক ভাতা পেয়ে থাকেন, কোনও না কোনও ভাবে। এটা অনেকেরই জানা নেই।

নারীকল্যাণ বিভাগ থেকে ভালো পরিমাণ সাহায্য পান যে সব মহিলারা তাদের ৯৯ শতাংশই ব্রাহ্মণ। অন্য মহিলারা যত চেষ্টাই করুন না কেন, তারা সেই আওতায় আসতে পারছেন না।

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে, ব্রাহ্মণ ও খৃষ্টানরা ছাড়া, সব মহিলারা পশ্চাদপদ অবস্থায় রয়েছেন। এমন কি খৃষ্টানদের মধ্যেও, যারা অনুন্নত শ্রেণি থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তারা এই দুই ক্ষেত্রে কোনও প্রগতি ঘটাতে পারছেন না।

ব্রাবিড় নারীদের মধ্যে, আমরা নিশ্চিত যে, হাজারে দশজনের বেশি শিক্ষিত নয়। এমনকি যে অল্প কিছু শিক্ষিত হচ্ছেন, তারাও তাদের শিক্ষাকে কাজে লাগাচ্ছেন না।

মুখ ঢেকে রাখার 'গোসা' প্রথা অনেক ভারতীয় নারীর মধ্যে প্রবেশ করেছে, ফলে তারা এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছেন, যা কি না পণ্ডর চেয়েও অধম। প্রতারণার সাহায্যে পুরুষেরা নারীদের এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে যে, নারীরা রক্তাংকর, পোষাক-আসাক নিয়ে যত উৎসাহী তত উৎসাহী শিক্ষা ও স্বাধীন কাজের ব্যাপারে নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “আমাদের দেশে প্রতিটি নারীর মর্যাদা তার কাজ দিয়ে পরিমাপ করা হয়, তার স্বামীর নাম দিয়ে নয়।” এটা প্রাধান্যযোগ্য যে, তার স্ত্রী এখনও একজন স্কুল শিক্ষিকা। কিন্তু আমাদের প্রতি রাজ্যে হাজার হাজার শিক্ষিতা ও ডিগ্রীপ্রাপ্তা কর্মহীনা ও আত্ম-মর্যাদাহীনা হয়ে রয়েছেন। তারা তাদের স্বামীদের সুনাম, সম্পদ ও ছায়ার নীচে নিজেদের আশ্রিত করেছেন।

প্রাচীন তামিল কবিগণ নারীশিক্ষার মূল্যের উপর জোর দিয়েছেন। এক বিখ্যাত কবিতায় নালাদিয়ার বলেছেন, “নারীর সৌন্দর্য তার চুলের বাঁধুনিতে বা পোষাকের ধরনে বা মুখের গেরুয়া রঙে নেই, রয়েছে কেবল তার শিক্ষায়।” ‘ইলাধির’ একটি কবিতায় বলা আছে, “সৌন্দর্য চলনের ভঙ্গিতে বা ক্রীড়ার

প্রাকর্ষণে নেই, রয়েছে কেবল অংক ও বর্ণের সমাহারে (অর্থাতঃ শিক্ষায়)।” কেবল রাশিয়ায় (অন্য কোনও দেশে নয়) আমরা দেখতে পাই নারীরা এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, ‘রাশিয়া’ শব্দটাই মনে হয় নারীর অধিকার বোঝায়।

রাশিয়ান মহিলা শ্রীমতী এত্রিমোভা লিখেছেন, (‘দি মেল’ পত্রিকায় ২৪.২.৬০ তারিখে), “আগামীকাল কি হবে তা নিয়ে অকারণে চিন্তিত না হয়ে, রাশিয়ার নারীরা বাকি দুনিয়ার নারীদের চেয়ে বেশি সুখী, বেশি স্বাধীন ও পূর্ণতর জীবনযাপন করেন। তারা তাদের শিক্ষা ও কাজকে তাদের অলংকার বলে মনে করে।”

তাই ভারতীয় নারীদের আকাঙ্ক্ষায় ও আদর্শে আদ্যন্ত এক বিপ্লব ঘটতে হবে। পুরুষেরা যে সমস্ত কাজ করে, সে সমস্ত কাজই করার জন্য তাদের উচিত নিজেদের প্রস্তুত করা। প্রাকৃতিক বাধাকে তাদের জীবনের বাধা হতে না দিয়ে রাশিয়ার মহিলাদের মত তাদের উত্তম গার্হস্থ্য জীবনযাপন করতে হবে।

বর্তমানে রাশিয়ায়, দুই লক্ষ তেরিশ হাজার মহিলা ইঞ্জিনিয়ার, মহিলা চিকিৎসকরা সংখ্যায় তিন লক্ষ, বার লক্ষ তিরিশি হাজার মহিলা স্কুল শিক্ষিকা। বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেন এমন মহিলারা জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ। তারা কি তাদের পরিবারের সাথে নেই? তারা কি সন্তান প্রসব করছেন না? তারা কি সং জীবনযাপন করছেন না?

অতএব, আমাদের নারীদের মনের মধ্যে এক স্বাগত পরিবর্তন আসা উচিত। প্রশাসকদেরও উচিত নারীপ্রগতিতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা।

(২৫.১.১৯৬০ তারিখে ‘বিনুখালাই’ পত্রিকায় পেরিয়ারের প্রধান নিবন্ধ)

□

নারী অধিকার ও বাবা সাহেব ড. বি. আর. আশ্বেদকর

কৃষ্ণা মণ্ডল বিশ্বাস

“একজন বালিকা বা যুবতী বা বৃদ্ধা গৃহে স্বাধীনভাবে কিছু করবে না। স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার বশে থাকবে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, স্বামী পরলোক প্রাপ্ত হলে পুত্রের অধীনে থাকবে।। কোনও পরিস্থিতিতে নারী স্বাধীন থাকবে না” (মনুস্মৃতি, ৫/১৪৭-১৪৮)।

“নারী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ পাপ যোনিতে জন্ম” (গীতা ৯/৩২)

“নারী নরকের দুয়ার” অথবা “নারীর অধিকার কেবল সন্তান জন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে”। ভারতীয় নারীদের উপর এমন অনুশাসনের পরম্পরার বোঝা নিশ্চিতভাবেই নারীকে সম্মানিত করেনি, বরং নারীর আত্ম মর্যাদা, আত্ম পরিচয় শাসক ও পুরোহিত তান্ত্রিক বেড়াগুলোে অকল্পিত করা হয়েছে। পতীর পুণ্যেই সতীর পুণ্য এমন আশ্রয়বাক্যের আবেগে নারীকে মোহগ্রস্ত করে রাখা হয়েছিল বহুকাল। বোঝানো হয়েছিল এতেই নারীর মঙ্গল, এটাই নারীর ইহকাল ও পরকাল। এই কুটিলতা ও ছলনার ভুলভালাইয়াতে পড়ে নারী তার অস্তিত্বটাই হারিয়ে ফেলতে বসেছিল, ভুলতে বসেছিল যে সে মানবিক। সার্বিক মানবাধিকারের অর্ধেক দাবিদার। সৃষ্টির অর্ধেক রূপকার, বিবর্তনের ইতিহাসে যা কিছু নিদর্শন তার বিনম্র সহচরী।

পুরুষ ও পুরোহিতদের এমন ছলনার ফলে ভুল হয়ে গিয়েছিল সব। যার জন্যেই নারী পরিণত হয়েছিল দাসী, বাদী ও ভোগের সামগ্রীতে। বাল্যে বিবাহ, বহু বিবাহ, অকাল বৈধব্য ও সতীপ্রথার মতো অসংখ্য কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল নারীর মাথায়। ঈশ্বরের নাম করে, ধর্মের নাম করে নারীকেই বলীর যুগ্মকাঠে চড়ানো হয়েছিল। ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে এটাই ছিল অমোঘ বিধান। নারীদের চেতন অবচেতন মনের মধ্যে এখনও এই কুসংস্কারের জঞ্জাল রয়ে গেছে। আমরা উৎকর্ষতার সাথে লক্ষ্য করেছি যে ভোগবাদী ছলনা ও প্রলোভনের

ফাঁদে পড়ে তাদের দেহের সৌন্দর্যকে বাজারের পণ্য হিসেবে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন। ব্যবসাদারদের বিজ্ঞাপন নারী দেহের কালোবাজারি ব্যবসা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে অল্প তুলে দিচ্ছে। কিন্তু শ্রদ্ধায় অবনত হই যখন জানতে পারি পুরোহিততন্ত্র ও ভোগবাদী চিন্তাগুলিকে আবর্জনা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলেন বি. আর. আশ্বেদকর।

“আমরা অতি শীঘ্রই সেই শুভদিন দেখব এবং আমাদের উন্নয়ন আরও গতিশীল হবে যদি আমরা পুরুষের সাথে সাথে নারী শিক্ষার মনোযোগী হই। নারী সমাজ কতটা এগোতে পারল সেই নিরিখেই আমরা সমাজের অগ্রগতির পরিমাপ করব। নারী শিক্ষিত হলে একটি পরিবারও সুশিক্ষিত হয়।” ১৯২০ সালে মুখ নায়ক ও ১৯২৭ সালে বহিষ্কৃত ভারতে প্রকাশিত এই যুগান্তকারী বিবৃতির মাধ্যমে মনুবাদী শাসন ব্যবস্থার পাহাড়গুলিতে ভাঙতে শুরু করলেন ড. বি. আর. আশ্বেদকর। অথচ এই নারী সমাজকে অবদমিত, অপমানিত ও শুল্লিত করে রাখা হয়েছিল যুগের পর যুগ। নারী দেহের অধিকার ও আত্মমর্যাদা বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ভাবগুরু জ্যোতি বা ফুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। যেভাবে জ্যোতি বা ফুলে তাঁর জীবনসঙ্গিনী সাবিত্রী ফুলকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন এবং সাবিত্রী ফুলে ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, সেইভাবেই বাবা সাহেব তাঁর জীবন সঙ্গিনী রমণীমাই আশ্বেদকরকেও সহনেত্রী হিসেবে সামনে রেখে মহিলা সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এই মহিলা সংঘের নেতৃত্বেই নাসিকে মন্দিরে প্রবেশের দাবিতে সত্যাগ্রহ পালিত হয়েছিল। অধিকাংশ নারীকেই ব্রিটিশ সরকার বন্দি করেছিল। নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল তাদের সাথে। জেলখানায় পুরুষ বন্দিদের সাথে একই জায়গায় রাখা হয়েছিল কিন্তু নারীরা তাতে দমে না গিয়ে আরও বিপুলভাবে আন্দোলনে সামিল হতে থাকল। আশ্বেদকর নারীদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে পরে এক বিবৃতিতে রাধাবাই ভাদালে, “চূড়ান্ত ঘৃণিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে একশোবার মরা ভালো। আমরা আত্মবিসর্জন দেব কিন্তু ছিনিয়ে নেব আমাদের কষ্টকৃত জয়।”

বাবাসাহেব সেই আন্দোলনে বেশ উৎসাহিত হয়ে বোধ করলেন যে নারীদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রাম সঠিক দিশা দেখাবে। তিনি উল্লেখ করতেন যে নারী যদি জীবনের সব কাজের উৎসাহ বোধ করেন তবে তার সামাজিক পুনর্গঠনের একটি

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে। সামাজিক পীড়ন বন্ধ করার জন্যে নারীরাই শ্রেষ্ঠ চালিকা শক্তি। তিনি নারীদের পুরুষকে স্বামী না ভেবে বন্ধু ভাবতে উৎসাহিত করতেন এবং নারী-পুরুষের সমান চারিত্রিক সক্ষমতা রাখতে উৎসাহিত করতেন। তিনি মনে করতেন নারীরা এই গুণগুলি অনুসরণ করলে তারা আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হবে। ১৯২০ সালে মুখ নায়ক পত্রিকার প্রকাশনার মাধ্যমে বাবাসাহেব আশ্বেদকর তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি প্রকাশ করলেন বহিষ্কৃত ভারত। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি দলিত সমাজের সমস্যাগুলি ও লিঙ্গ সমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। পুরুষের সাথে সমান দক্ষতায় সমান ক্ষমতা অর্জন করার উপর গুরুত্ব দেন নারীর সম্পত্তির অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাঁর অনলশ প্রয়াস তৎকালীন নারীবাদীদের উৎসাহিত করে। মাদক দ্রব্য গ্রহণের বিপক্ষে তিনি বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে মনোবিজ্ঞানীদের মতে, নেশা পারিবারিক কলহের অন্যতম কারণ এতে নারী পুরুষের অভ্যন্তরীণ সখ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।

খসড়া সংবিধানে তিনি এমনকিছু প্রস্তাব রাখেন যা নারীর কল্যাণ ও সামাজিক অধিকার সুনিশ্চিত করেন। সংসদে তিনি ম্যাটারনিটি বেনিফিট বিল (গর্ভকালীন ছুটি সহ) নারীর সম্পত্তি অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। নেহরু সহ অন্যান্য নেতারা এই বিলের বিরোধিতা করেন। নারীদের অধিকার আদায়ের ভারতীয় নেতাদের এমন অনীহা দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং মন্ত্রী পদ থেকে পরিত্যাগ করেন। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য এমন ত্যাগ একটি বিরল ঘটনা। নেহরুর নেতৃত্বে তদারকি সরকার হিন্দু কোড বিল স্বীকার না করলেও আইনমন্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকারকে সাংবিধানিক হিসেবে কার্যকর করতে বললেন। মনুষ্যতিকে নারীকে দাসী, বাদী, নির্বোধ হিসেবে অবজ্ঞা করে বিদ্যা, শিক্ষা, অস্ত্রধারণ ও সম্পত্তি থেকে বাতিল করা হয়েছিল। আশ্বেদকর মনুর বিধানকে কার্যত অকেজো করতে চেয়েছিলেন। নারীদের সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য সংবিধানের নানা অধ্যায় রচনার মাধ্যমে নারীর অধিকারকে প্রাসঙ্গিক করতে চেয়েছিলেন। নারীদের পর্যাপ্ত ভাগীদারীর জন্য সংবিধানে যা যা সংযোজিত করতে চেয়েছিলেন তা হলো :—

অধ্যায় ১৪ : সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমানাধিকার

অধ্যায় ১৫ : লিঙ্গ বৈষম্যের উপর নিষেধাজ্ঞা

অধ্যায় ১৫ (৩) : নারীদের উপর দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

অধ্যায় ৩৯ : জীবিকা নির্বাহে নারীদের সম অধিকার ও সম কাজে সম বেতন

অধ্যায় ৯৪ : কর্মক্ষেত্রে মানবিক পরিবেশ ও মাতৃকালীন ছুটি

অধ্যায় ২৪-৩ডি.

৩ আর, ৩ টি : পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণ

নারীদের এবং দুর্বলতর সমাজের সমানাধিকারের এই অসম লড়াইতে তিনি ছিলেন দৃঢ় চিত্ত। সম্ভবত একলব্যের কাহিনী থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। সদা সতর্ক অক্লান্ত ছিলেন তিনি। এককভাবেই ভঙ্গ করতে ছিলেন মনুবাদীদের চক্রান্ত। অবহেলিত নারীদের সার্বিক উত্থানে সমস্ত সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। ভোগবাদী অর্থনীতির ফাঁদে পড়ে আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বিকল্প কল্যাণকামী ব্যবস্থার সন্ধান শুরু করেছে আর তাই প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন আশ্বেদকর।

□

বি.বি.সি.র প্রচারে বি. আর. আশ্বেদকর

[ডাঃ বাবাসাহেব আশ্বেদকরের এই সাক্ষাৎকারটি বিবিসিতে প্রচারিত হয় ৩১/১২/১৯৫৫ সালে। আজকের দিনে দলিত আন্দোলন, হিন্দুত্ব, সংরক্ষণ এবং গান্ধীবাদের বিভিন্ন সংমিশ্রণ যখন ২০১৪-র লোকসভা ভোটের পরে দেখা যাচ্ছে তখন সেই মানুষটি যিনি এখনও দলিতদের কাছে গর্ব, তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আশা ভরসার রক্ত মাংসের ছবি, তিনি কী ভাবতেন “মহাত্মা” গান্ধী সম্পর্কে? কেমনভাবে একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে তিনি দেখেছিলেন গান্ধীকে? এই বিনির্মাণ বা অতিনির্মাণের যুগে নীড়িয়েও শুধু তার কথাটুকু শুনলেই মনে হবে এ যেন আজকের কথা... এ ইতিহাস হয়তো লেখা হবে না পাঠ্য পুস্তকে। চেষ্টনা লহরের সূত্রে কোথাও কেউ মনে করুক এই ইতিহাসকে সেকথা ভেবেই সাক্ষাৎকারটির মোটিমুটি সং একটা অনুবাদ করা হল।]

ভাষান্তর : ইন্দ্রনীল সাহা

আশ্বেদকর :—গান্ধীর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯২৯ সালে, এক বছর মাধ্যমে। আমাদের এক বন্ধু মিঃ গান্ধীকে অনুরোধ করেন আমার সাথে আলাপ করার জন্য। মিঃ গান্ধী আমাকে চিঠি লেখেন এবং আমার সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমিও যাই ওনার সাথে দেখা করতে। সে সময়টা ছিল ১৯২৯, প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের ঠিক আগে। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী আসেননি। কিন্তু তারপর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে উনি আসেন। সে সময় আমি ওনার সাথে অনেকবার দেখাও করেছিলাম এবং রাজনৈতিকভাবে মুখোমুখিও হয়েছিলাম। এরপর পুনা চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই উনি আমাকে দেখা করতে অনুরোধ করেন। তখন উনি জেলে। আমি দেখা করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলতে চাই—আমি গান্ধীকে দেখেছি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে। কখনও কখনও আমার মনে হয় এভাবে দেখাতে আমি ওনাকে অনেকের চেয়ে অনেক ভালো চিনতে পেরেছি। গান্ধীকে আমি দেখতে পেরেছি একজন মানুষ হিসেবে, তার ভেতরের মানুষটাকে। যারা তার কাছে গিয়েছিলেন শিষ্য হিসেবে তাঁরা তাঁর সেই রূপ কখনওই দেখতে পাননি। তাঁরা শুধু তাঁর বাইরের রূপটুকুই দেখেছে যেখানে তিনি মহাত্মা। আমি আবার বলব আমি মহাত্মা

গান্ধী নয় মানুষ গান্ধীকে দেখেছি যা তাঁর শিষ্যগণ দেখতে পাননি।

বিবিসি—আপনি কিভাবে আপনার দেখাকে ব্যাখ্যা করবেন?

আঃ—স্বীকার করতে অসুবিধা নেই যে আমি বেশ খানিকটা অবাকই হই যখন দর্শণ পৃথিবীর লোকেরা, বিশেষত পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা যখন গান্ধীকে নিয়ে এতটা মাতামাতি করছেন। আমি এটা বুঝতে পারি না। এটুকু বলতে পারি, ভারতের ঐতিহ্যসের ক্ষেত্রে, গান্ধী ছিল একটা অধ্যায়ের নাম, আর কিছু নয়। মানুষের স্মৃতি থেকে গান্ধী ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছেন। মানুষের মনে গান্ধীর যেটুকু স্মৃতি অবশিষ্ট আছে তা আছে কারণ কংগ্রেস পার্টি প্রতি বছর গান্ধীর জন্মদিনে জাতীয় ছুটি দেয় আর এছাড়া তার জীবনের বিভিন্ন দিনগুলি পালন করে। সপ্তাহকালব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে গান্ধীর স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা গিয়ে থাকে। কিন্তু এইসব কৃত্রিম মাতামাতি না থাকলে, আমার মনে হয় গান্ধী অনেক অনেক আগেই জনগণের স্মৃতি থেকে বিদায় নিতেন।

বিবিসি—আপনি মনে করেন না উনি ভারতীয় রাজনীতিতে কোনও মৌলিক পরিবর্তন এনেছিলেন...

আঃ—না না, আসৌ না। এমনকি আসলে উনি সবসময়ই দুরকম কথা বলে গেছেন। উনি দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন—একটি ইংরেজি (দি হারিজন) আরেকটি গুজরাটি। আপনি যদি ওনার প্রকাশিত দুটি পত্রিকাই পড়েন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে উনি মানুষকে ভুল বুঝিয়েছিলেন। ইংরেজি কাগজে উনি জাতপাত, অস্পৃশ্যতার বিরোধী, গণতন্ত্রের পূজারী। কিন্তু গুজরাটি কাগজে উনি সেইচেনা ছকের কথা বলেন—জাতপাত ও বর্ণাশ্রমের সমর্থক, সেই সমস্ত পুরনো গতানুগতিক ভাবনা যা ভারতবর্ষকে পিছনে টেনে ধরে রেখেছে তার সমর্থক। কেউ যদি গান্ধীর জীবনী লিখতে চান তাহলে তিনি যদি শুধু গান্ধীর ইংরেজি আর গুজরাটি লেখার একটা তুলনামূলক আলোচনা করেন তাহলেই একটা বড় কাজ করা হবে। পাশ্চাত্যের সব পণ্ডিতরা শুধু গান্ধীর ইংরেজি লেখাই পড়েন আর ভারতের মানুষকে তাদের ভাষাতে গান্ধী কি বলেছিলেন সে খবর তাদের অজানাই থেকে যায়।

বিবিসি—তাহলে ওনার আসল ইচ্ছা কী ছিল SC/ST বিষয়ে?

আঃ—দেখুন বিগত ২০০০ বছর ধরে আমরা অস্পৃশ্যতার বোঝা বয়ে নিয়ে

বেড়াছি। কেউ কোনওদিন এ প্রসঙ্গে কোনও কথা বলেনি। আমরা চাই অস্পৃশ্যতার অবসান। কিন্তু শুধু অস্পৃশ্যতার অবসান সমস্যার সমাধান নয়। আমাদের দরকার সমান সুযোগ যাতে আমরা উঠে আসতে পারি বাকি জাতগুলির সমকক্ষ হতে পারি। শুধুমাত্র ছোয়াছুয়ির বেলাতেই নয়, আমাদের দরকার সুযোগ যাতে আমরা বড় সরকারি চাকরি পেতে পারি, সরকারের নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারি। এ বিষয়ে গান্ধী আমাদের পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন। একেবারেই পুরোপুরি বিরোধী।

বিবিসি—উনি শুধু মন্দিরে প্রবেশ অধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন...

আঃ—একদম তাই। শুধু মন্দিরে প্রবেশ অধিকার। সেখান মন্দিরে প্রবেশ অধিকার নিয়ে অচ্ছুতদের খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। আমি হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ অধিকার পেলাম অথচ আমার গ্রামে আমি পড়ে রইলাম বাইরে অস্পৃশ্য হিসেবে। একসময় হিন্দুরা অচ্ছুতদের ট্রেনে চড়তে দিত না কিন্তু আজ সে অবস্থা নেই—তাতে কী খুব বেশি কিছু যায় এসেছে কারও?

বিবিসি—আপনি বলতে চান উনি অচ্ছুতদের কোনও মৌলিক পরিবর্তন চাননি...

আঃ—একদম ঠিক। ওনার হরিজন আন্দোলন আসলে কেবলমাত্র হরিজনদের কংগ্রেসে নিয়ে আসার একটি মামুলি ছক ছাড়া কিছুই না। এছাড়াও একটা ব্যাপার ছিল, উনি চেয়েছিলেন যেন কোনওভাবেই হরিজন আন্দোলন ওনার স্বরাজের মুখোমুখি না দাঁড়ায়। উনি গ্যারিসন নন যিনি আমেরিকাতে নিগ্রোদের অধিকারের প্রকৃত লড়াই লড়েছিলেন।

বিবিসি—আপনি কি মনে করেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা গান্ধী ছাড়াও আসত?

আঃ—অবশ্যই। স্বাধীনতা আসবারই ছিল। হয়তো তা হতো আর একটু দীর্ঘ গতিতে এবং তাতে ভারতের আপামর জনগণের আরও ভালোই হতো। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলি নিজেদের ঘর গুছানোর আরও বানিকটা সময় পেত। আজ (১৯৫৫ সালে - অনুবাদক) দেখুন হঠাৎ করে পাওয়া স্বাধীনতা নিতে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীগুলি আদৌ তৈরিই হতে পারেনি।

বিবিসি—আপনি কি মনে করেন গান্ধী কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বার্থ দেখেছিলেন স্বাধীনতার সময় নির্বাচনের ক্ষেত্রে?

আঃ—দেখুন এটা আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে আমি জানিনা মিঃ

খাটলে (Clement Richard Attlee সে সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, লণ্ডন পাটি - অনুবাদক) হঠাৎ কি করে রাজি হয়ে গেলেন স্বাধীনতা দিতে। এটা একটা সিক্রেট। আশা করি ভবিষ্যতে কোনও একদিন মিঃ খাটলে নিশ্চয়ই সে কথা উন্মোচন করবেন তার আত্মজীবনীতে। কেউ এটা আশা করেনি, হঠাৎ করে শ্রী খাটলে ঘটল যাতে এমন তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা করতে হলো। আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি বলেন তাহলে বলতে পারি দুটি বিষয় এক্ষেত্রে কাজ করেছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ শাসন নিশ্চিত ছিল যে ব্রিটিশ রাজের শান্তি সেনাবাহিনীর আনুগত্য অটুট থাকবে। সে ধারণাটা একটা বড় ধাক্কা খায় শ্রী খাটলে বোসের কাছে। সেনাবাহিনীর মধ্য বিদ্রোহ এক বাস্তব সম্ভাবনা হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে ভারতে শাসন চালাতে গেলে ব্রিটিশকে অনেক অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হতো ইউরোপিয়ান সেনা পুষতে। অর্থাৎ সেই ১৮৫৭-এর দশপাঠা বিদ্রোহের পরিস্থিতি। আর তাছাড়া ভারতবর্ষের বিশালতা মনে করলে, দেশ বড় দেশকে ব্রিটিশ সেনা দিয়ে দমন করতে গেলে যত সেনা লাগত তা ইংল্যান্ডের পক্ষে যোগানোও সম্ভব ছিল না। এছাড়া যে বিষয়টা শাসকের মধ্যে কাজ করেছিল তা হলো তার ব্যবসা এবং পুঁজির স্বার্থ সুরক্ষিত করা। যদি ভারত রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হয়েও যায় কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজি ভারতীয় শাসকদের হাতে পূর্ণাঙ্গত থাকে তাহলে অসুবিধা কোথায়? বরং সেটা মেনে নিয়ে সেরকমভাবে শাসনপদ্ধতি করাটাই বাস্তবোচিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত।

বিবিসি—পূনা চুক্তির সময় আপনার এবং গান্ধীর মধ্যে কি কথা হয়েছিল সে বিষয়ে যদি কিছু বলেন। (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সালে পূনের ইয়েওয়াড়া মেলে গান্ধী এবং আশ্বেদকরের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর বিষয় ছিল খামান উত্তর ভারতের সংবিধানের পরিকল্পনা এবং সেখানে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলির আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। এ বিষয়ে আশ্বেদকরের সাথে গান্ধীর চরম বিরোধ হয় কারণ গান্ধী অচ্ছুতদের আলাদা প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করতে চাননি। পরে অবশ্য তাকে আশ্বেদকরের যুক্তির সামনে হার মানতে হয়। এই মর্মে স্বাক্ষরিত চুক্তি ইতিহাসে পূনা চুক্তি নামে বিখ্যাত)

খাঃ—রামসে ম্যাকডোনাল্ডের (Ramsay MacDonald, ১৯৩২ এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) প্রাথমিক বসড়ায় উনি আমার প্রস্তাব মেনে নেন। আমি বলেছিলাম

দেখুন হিন্দুরা অজুতদের আলাদা প্রতিনিধিত্ব চায় না কেন না তা নাকি জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। কিন্তু আমরা, দলিতরা মনে করি যে যদি আমাদের আলাদা প্রতিনিধিত্বের অধিকার না থাকে, তবে আমরা উঁচু জাতের নীচে চাপা পড়ে যাওয়া আর পিছড়ে বর্ণের প্রতিনিধি হিসেবে যে থাকবে সে পরিণত হবে উঁচু জাতের বাবুদের চাকরে। আমাদের আলাদা প্রতিনিধিত্বের অধিকার পেতেই হবে। আরো বলেছিলাম আমাদের দুটো ভোট থাকুক—একটা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আর একটা সাধারণ নির্বাচনের ভোটাধিকার সেক্ষেত্রে আলাদা জাতীয় সংহতির কোনও সমস্যা থাকছে না। আমি বলেছিলাম সারা জীবন দলিতদের হিন্দুদের থেকে আলাদা হয়ে থাকতে হয়, কোনওরকম সামাজিক বা ধর্মীয় মিশ্রণের প্রশ্নই নেই হঠাৎ পাঁচ বছরে এক দিনের ভোট যজ্ঞে এক হিন্দুদের সাথে একসাথে ভোট উৎসবে যোগদানের মধ্য দিয়েই কি জাতীয় সংহতির বিকাশ ঘটে যাওয়া সম্ভব? এ হতে পারে? এটা কি বোকার মতো চিন্তা নয় যে দুটো লোক একসাথে একই বুথে ভোট দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের হৃদয় পরিবর্তন হয়ে যাবে? এ কারণেই আমি ওনাকে (ম্যাকডোনাল্ডকে) বলেছিলাম আমাদের দুটো ভোট দিন। Communal Award ও আমার প্রস্তাব ছিল যা ম্যাকডোনাল্ড গ্রহণ করেন। কিন্তু গান্ধী কখনওই চাননি আমরা দলিতরা আমাদের নিজেদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার পাই। সুতরাং উনি অনশন শুরু করে দিলেন। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড বললেন Communal Award জাতীয় সংহতির পরিপন্থী নয় বরং বিভিন্ন জাতিগুলিকে কাছে আনার চেষ্টা আর তাই সরকার একে প্রত্যাখ্যান করবে না। কিন্তু গান্ধী অটল। উনি বললেন ভারতে আমি শুধু তিনটি জাতিকে স্বীকৃতি দিতে পারি—হিন্দু, মুসলিম এবং শিখ। রাষ্ট্র কেবলমাত্র এই তিনটি জাতিকেই স্বীকার করবে তার সংবিধানে। ব্রিস্টান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা দলিত জাতিগুলিকে সংবিধান স্বীকার করবে না। তাদেরকে মিশে যেতে হবে অন্য জাতির মধ্যে। এরকম অদ্ভুত কথা এমনকি তার বন্ধুরাও সমর্থন করতে পারেননি। তারাই প্রবল তুললেন—আচ্ছা আপনি যদি মুসলমান এবং শিখদের আলাদা স্বীকৃতি দিতে সম্মত হন যারা দলিতদের থেকে অন্তত ১০০০ গুণ বেশি শক্তিশালী রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে, তাহলে দলিতদের আপনি ভুলে যান কি করে? এ প্রশ্নের তার একটাই জবাব ছিল—তোমরা আমাদের সমস্যা বুঝবে না—ব্যাস এইটুকুই। মিঃ আলেকজান্ডার এবং তার অনুগামী এক ফরাসী

মহিলা, (নামটা স্মরণে আসছে না এখন), গান্ধীর সাথে এক বড় বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এ বিষয়ে। তারা বললেন, দেখুন আপনি যদি বলেন কোনও জাতি বর্ণ বা ধর্মের কোনও উল্লেখ বা স্বীকৃতি সংবিধানে থাকবে না তাহলে সে কথার একটা মানে হয় এবং সেটা গণতান্ত্রিক। কিন্তু আপনি যদি বলেন শুধু বেছে বেছে হিন্দু, মুসলমান আর শিখদের স্বীকৃতি থাকবে তবে তার কোনও মানে হয় না। গান্ধী কোনও উত্তর দিতে পারেননি। গান্ধী আদৌ দলিতদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করতেই লক্ষ্য রাখেন না। তার নিজের উপদেষ্টামন্ডলীই তখন তাকে বলেন যে এতটা গোপনীয় কেউই সমর্থন করবে না। সে সময় মিঃ মালব্য (মদনমোহন মালব্য—মহাশয়) আমার কাছে আসেন একটা আপোষ রফার জন্য। আমি ওনাকে বলি যে আমি ব্রিটিশের সাথে লড়াই করে দলিতদের যে অধিকার আদায় করেছি তা গান্ধীর সাথে রফার স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে পারব না। যাইহোক একটা আপোষ রফা সূত্র আমি প্রস্তাব করি। দলিতরা তাদের তরফ থেকে চার জন প্রতিনিধিকে মাঝে নির্বাচন করবে যারা সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। এবং সাধারণভাবেই এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে সেই শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হবে। এর মধ্য দিয়ে অন্তত এটুকু করা যাবে যে উঁচু জাতের লোকেরা দলিতদের পাশে থাকবে তাদের ইচ্ছামত নির্বাচন করতে পারবে না। এই প্রস্তাব আর গান্ধীর মধ্যে পারিষদ করা সম্ভব হয়নি। এই ফর্মুলায় একটি মাত্র নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৭ সালে এবং সেখানে গান্ধীর মনোনীত একজন প্রার্থীও জয়ের মুখ দেখেননি।

বি.বি.সি.—গান্ধী কি এ বিষয়ে দর কষাকষি করেছিলেন?

বি.বি.সি.—ভয়ঙ্কর রকম। আমি ওনাকে বলেছিলাম দেখুন আমি আপনার জীবন এবং গণমান বাঁচাতে চাই কিন্তু তা আমার দলিত ভাইদের বলি দিয়ে নয়। আপনি বলুন গণমাণ পাঁচ বছরে একদিন একটা সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে কিভাবে মানুষের ঐক্যের তার সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে?

বি.বি.সি.—এর জবাবে উনি কি বলেছিলেন?

বি.বি.সি.—উনি কিছুই বলতে পারেননি। উনি ভয় পেয়েছিলেন যে একদিন দলিতরা গণমান শক্তিশালী হয়ে উঠবে শিখ এবং মুসলিমদের মতো এবং হিন্দুরা একা হয়ে থাকবে, কোণঠাসা হয়ে যাবে যখন দলিত, মুসলিম, শিখ এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিগুলি মাথা তুলে দাঁড়াবে।

বিবিসি—এ বিষয়ে উনি একজন সাধারণ রাজনৈতিক নেতার মতই আচরণ করেছিলেন মহাত্মা হিসেবে নয়।

আঃ—একদমই তাই। উনি একজন হিন্দু রাজনৈতিক নেতা ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। আমি কোনওদিন ওনাকে মহাত্মা বলে সম্বোধন করিনি, আমি মনে করি না উনি মহাত্মা ছিলেন। এমনকি নৈতিকতার বিচারেও আমি ওনাকে মহাত্মা বলতে পারব না।

□

রোকেয়া প্রসঙ্গে

লায়লা জামান

মৌলবী মুজিবুর রহমান (১৮৬৯-১৯৪০)—সম্পাদিত ইংরেজি সংবাদপত্র দি মুসলমান-এ (১৯০৬-৩৬) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) বেশ কিছু রচনা ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এসব রচনা এখনো তাঁর 'রচনাবলী'-তে অগ্রহীত রয়েছে। আবদুল কাদির-সম্পাদিত রোকেয়া-রচনাবলীতে সংকলিত হয়নি। রোকেয়ার জীবনীকার ও গবেষকেরা যে-সব রচনা ও পত্রাদির কোন সন্ধান পাননি বা উল্লেখ করেননি,^১ আমরা সেরকম কয়েকটি অগ্রহীত রচনা ও চিঠি এখানে আলোচনা ও সংগ্রহ করেছি। এ সকল অগ্রহীত রচনা ও তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। রোকেয়ার গ্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস পুনর্গঠনে এসব দুখপ্রাপ্য তথ্য মূল্যবান উপাদানরূপে বিবেচিত হতে পারে।

দি মুসলমান পত্রিকায় প্রকাশিত রোকেয়া-রচনা ও পত্রাবলীতে তাঁর সাহিত্যচিন্তা নয়, সমাজ চিন্তাই মূর্ত হয়েছে।

এই সংকলনে এসব রচনার ভিত্তিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁর সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দান, কলকাতার মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যমরূপে উর্দু-বাংলা বিতর্ক সম্পর্কে তাঁর মতামতের উপস্থাপনা, মুসলিম মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন-আয়োজনে রোকেয়ার ভূমিকা ও তাঁর মনোভাব অনুসন্ধান এবং উল্লিখিত দুখপ্রাপ্য পত্রিকার ছিন্নপত্র থেকে তাঁর রচনা-সংকলন করা হয়েছে।

নিজেকে বরণীয় বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা অথবা স্বামীর স্মৃতি সংরক্ষণ বা বৈষয়িক উন্নতি — রোকেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে এর কোনটাই ফ্রিশীল ছিল না। মুসলমান মেয়েদের দুরবস্থা ও দুর্গতি তাঁকে পীড়িত করেছে। মুসলমান মেয়েরা যেন তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তারাও যেন মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে আত্মবিকাশ করতে পারে, এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই রোকেয়া ১৯১১ এর ১৬ মার্চ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল

গার্লস স্কুল স্থাপন করেন।

এ সময়ের কলকাতায় অবস্থিত স্কুলগুলোর পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে,

এ বছর পর্যন্ত কলকাতায় মেয়েদের জন্যে বেতুন কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল এবং ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলসহ সাতটি উচ্চ বিদ্যালয় ও ছটি এম. ই. স্কুল, পাঁচটি ভার্নাকুলার স্কুল, ৪১টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৪১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। মুসলমান মেয়েদের জন্যে নিম্ন প্রাথমিক উর্দু স্কুল ছিল ১৪টি, ২৫টি কোরান স্কুল অর্থাৎ মক্তব। কিন্তু একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল না অথবা বাংলাভাষী মুসলমান বালিকাদের জন্যেও একটি স্কুলও ছিল না।*

সমকালীন ইতিহাসেও দেখা যায় শুধু মুসলমান মেয়ে কেন পুরুষদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি। এ সময়ে মুসলমান-সম্পাদিত কয়েকটি প্রগতিশীল পত্রিকা এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১) বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অগ্রসর চিন্তার বীজ বপন করে। বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতা ও প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি রোকেয়াকে বিচলিত করে।

আলোচ্য ও সংকলিত রচনাসমূহে রোকেয়ার উৎকণ্ঠা ও একই সঙ্গে সামাজিক বাধা প্রতিহত তাঁর দৃঢ় মনোবল প্রকাশিত। এই মনোবল ও নিষ্ঠা বাঙালি মুসলমান মহিলাদের অগ্রগতির পথে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু বাঙালি মুসলমান মহিলা নয়, সমগ্র মুসলমান সমাজে রোকেয়ার ভূমিকা প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের মন্তব্য স্মরণীয় :

... মিসেস আর. এস. হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য এক দৈব আশ্বাস। নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয়, তবে আজো ভয় কেন বাংলা মুসলমানের ঘোচে না? তবে আজো কেন নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী বলে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না?"

দি মুসলমান পত্রিকায় ১৯০৮ থেকে ১৯৩২ অর্থাৎ রোকেয়ার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর যেসব রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি নিবন্ধ God

gives man robs, একটি আবেদন, তিনটি সুদীর্ঘ প্রতিবাদপত্র, একটি প্রতিবেদন, স্কুলের প্রসপেকটাস এবং নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।

এ পত্রিকায় এই সময়ে রোকেয়ার এসব রচনা ছাড়াও তাঁর মতিচূর (প্রথম খণ্ড, দ্বি-স ১৯০৭) ও ইংরেজি পুস্তিকা Sultan's Dream (১৯০৮)-এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা,* সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ ও সম্পাদকীয়, রোকেয়ার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার খবর, রোকেয়ার স্কুল ও সেহরাওয়াদীয়া বেগম সম্পর্কে ছদ্মনামধারী তিন জনের চিঠি, রোকেয়ার স্কুলে উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়ে রফিকুর রহমানের দুইটি চিঠি ও নওশের আলী খান ইউসুফজীর (১৮৬৪-১৯২৪)* একটি চিঠি, কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লেডিজ কনফারেন্সের ৬ষ্ঠ অধিবেশন সম্বন্ধে একটি প্রতিবাদলিপি, মতিচূর ও সুলতানাজ ড্রিম-এর বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছিল।

উল্লিখিত রচনাসমূহে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের পরিচালনায় আর্থিক ও সামাজিক অসুবিধায় রোকেয়ার উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ, স্কুলে শিক্ষার মাধ্যমরূপে উর্দু প্রচলন এবং বাংলা মাধ্যম চালু রাখতে না-পারার কারণ ও পটভূমি ব্যাখ্যা, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ব্যাপারে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে রোকেয়া যে প্রতিবেদন ও প্রতিবাদলিপি রচনা ও প্রকাশ করেছেন তার পরিচয় বিবৃত।

স্কুল পরিচালনায় যে বাধাবিঘ্ন ঠেলে তাকে চলতে হয়েছে প্রায় নিঃসঙ্গ; তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাঁর হতাশা ও অসহায়ত্ব, তাঁর বঞ্চনা ও ক্ষোভ, ক্রোধ ও কৌতুকবোধ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এসব লেখায়।

আবার দি মুসলমান সম্পাদক মৌলবী মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহমর্মিতার প্রমাণও আছে এ সকল লেখা প্রকাশে তাঁর সহায়তায়। সম্পাদক মুজিবুর রহমান সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে (৭ তারিখে) আবুল কাসেমের সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক দি মুসলমান কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার ম্যানেজার মুজিবুর রহমান পরবর্তীকালে ("after a month and a

half") এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকাটি সপ্তাহে তিন দিন (মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবারে) প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৩২ সালের ৮ই জুলাই থেকে তা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।

(ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ২০৮)

এই পত্রিকাটির গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

... The mussalman is the unique regular English journal that was published from Bengal for long three decades (1906-36).

The main motive behind launching the paper as an organ of Muslim public opinion (as its name signifies) was safeguard the interests of the Muslim community, furthering their progress, achieve Muslim solidarity and maintain cordial relationship with the non-Muslims. ...

One of the substantial contributions of the journal has been to create a group of young writers and pressmen notably Mohammad Wajed Ali (1896-1954), Abul Mansur Ahmed (1897-1979) and Abul Kalam Shamsuddin (1897 - 1978), whose contributions to the shaping of the Bengali Muslim intelligentsia was of great significance in our national life. Among the writers of the Mussalman the most prominent were **Rokeya Sakhawat Hossain** (1880-1932), Muhammad Shahidullah (1885-1969), Abdul Karim (1863-1943), S. Wajed Ali (1890-1951), Syed Emdad Ali (1880-1956), Abu Lohani

(1892-1929), M. Azizul Huque (1892-1947) and some **Hindu authors**.

(ড. Introduction, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত Selection from the Mussalman 1906-08, কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৪)।

এই পত্রিকার ইতিহাস লিখেছেন আবুল ফজল তাঁর সাংবাদিক মুজিবর রহমান গ্রন্থে এবং মুজিবর রহমানের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেছেন আনিসুজ্জামান (পূর্বোক্ত : সিলেকশনস ফ্রম দি মুসলমান-এর 'ফরওয়ার্ড'-এ)।

রাজনীতিক ও সাংবাদিক মুজিবর রহমান এবং তাঁর সম্পাদিত দি মুসলমান পত্রিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যসাধনা এবং তাঁর নারীশিক্ষা-আন্দোলনে যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তার ইতিবৃত্ত এখনো রচিত হয়নি। রোকেয়ার রচনা ও পত্রাদি এবং তাঁর বইয়ের সমালোচনা-বিভাগ ছাড়াও এই ইংরেজি সাময়িকপত্রে রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রসপেকটাস থেকে শুরু করে কর্মকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দি মুসলমান পত্রিকার প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী সংখ্যাও বিদেশের ও ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের "বাণী"র সঙ্গে রোকেয়ার "অভিনন্দন-বাণী" প্রকাশ করে ১৯২৬ ও ১৯২৭-এ।

দি মুসলমান পত্রিকার ফাইল বর্তমানে দুপ্রাপ্য; আমরা সব সংখ্যা দেখার সুযোগ পাইনি। তবে অনুমান করি, এই বইয়ে সংকলিত রচনাদি ছাড়াও রোকেয়ার আরো বেশ কিছু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকবে। দি মুসলমান পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ রোকেয়ার কোন গ্রন্থভূক্ত না-হওয়ার একমাত্র কারণ হতে পারে এই যে, সুলতানাজ ড্রিম পুস্তিকাটি ছাড়া তাঁর কোন ইংরেজি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে রোকেয়া-রচনাবলীতে সংকলিত না-হওয়ার কারণ, অনুমান করি, এই পত্রিকার দুপ্রাপ্যতা। একমাত্র কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে দি মুসলমান পত্রিকার প্রায়-পুরো-ফাইল সংরক্ষিত আছে আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আছে দুটি বিশেষ সংখ্যা। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দি মুসলমান-এর মাইক্রোফিল্ম সংগৃহীত হয়েছে বলে

জানা গেছে।

রোকেয়া নিজে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও দি মুসলমানের উল্লেখ করেছেন। (ড. গোলাম মুরশিদ, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া/নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৬); রোকেয়ার মৃত্যুর আগের রাতে লেখা অসমাপ্ত রচনায়ও দি মুসলমান পত্রিকার কথা আছে। (ড. মোশফেকা মাহমুদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ. ৩২)।

এই পত্রিকায় সম্পাদক মুজিবর রহমান এবং রোকেয়া ছাড়াও দেশী-বিদেশী অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের রচনা পত্রস্থ হতো। পত্রিকার লেখক-তালিকায় ছিলেন অন্যান্যের মধ্যে মিসেস এ. ই. সলোমন, আবদুল করিম, মিস মমতাজ শাহনওয়াজ, ডাঃ আর. আহমদ, বিমলেন্দু ধর, ডবলু. ইসলাম, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, “জাহিদা”, মুর্শিদাবাদের নবাব, অধ্যাপক আলতাক হোসেন, ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ, খাজা নুরুদ্দীন, সামী, এম. ইলমুদ্দিন, অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী, স্যার এ. কে. গজনবী, স্যার আজিজুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস. ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ এমদালা আলী, তসদক আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রমুখ।

মুজিবর রহমান ও রোকেয়া দুজনেই নারীশিক্ষার আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। মুজিবর রহমান সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন : He was a champion of female education.

(ড. আনিসুজ্জামান, “Foreword”, Selections from the Mussalman 1906-08, কলকাতা, ১৯৯৪)।

নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবক-সম্মিলনী বর্ধমান অধিবেশনে (১৯২৭) সভাপতির অভিভাষণে মুজিবর রহমান যে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি বলেন,

দ্রষ্টবিশ্য যে সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক তাহা বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীতে আপনাদিগকে বুঝাইতে ইহাবে না। জনগণের অর্ধেক অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন থাকলে সমাজের উন্নতি সম্ভবপর হয় না। শিশু যখন মায়ের বক্ষের ক্ষীরধারা পান করিতে থাকে, তখন ইহাতেই তাহার শিক্ষা

আরম্ভ হয়। ... সুতরাং আপনারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দান করুন, তাহাদিগকে শিক্ষা ইহাতে দুরে। যদি পুরুষগণের এই স্বার্থপরতা উন্নত রুচিসম্মত ইহিত, তবে আজ নারীগণের অবস্থা ভিন্নরূপে পরিবর্তিত দেখিতাম। তাহা ইহিলে সেই স্বার্থপরতাই নারীগণকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী এবং সমাজের কল্যাণপ্রসূতি করিয়া তুলিত। (সপ্তম-কার্তিক ১৩৩৪ উদ্ধৃত, আবুল ফজল, সাংবাদিক মুজিবর রহমান, পৃ. ৫৫-৫৬)।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে চ্যাম্পিয়ন অব ফিমেল এডুকেশন মুজিবর রহমান স্বাভাবিকভাবেই রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল এবং আনজুমনে খাওয়াতিন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাজে সক্রিয় সহায়তা করেছেন।

রোকেয়ার প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হলে দি মুসলমান তথা তার সম্পাদক মুজিবর রহমানের কথা উপেক্ষিত হবে না, আশা করা যায়। দি মুসলমানের ইতিবৃত্ত রচিত হলেও এর অন্যতম প্রধান লেখিকা রোকেয়ার অবদান লিপিবদ্ধ হবে।

“খাতুন” স্বাক্ষরিত রোকেয়ার একটি আবেদন দি মুসলমানের^{১১} ফেব্রুয়ারি ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। “এ প্রোপোজড গার্লস স্কুল” শিরোনামে এই পত্রেই রোকেয়া তাঁর স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ঘোষণা প্রকাশ করেন। অবশ্য ১৯০৯-এ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ বছরেই বিহারের ভাগলপুরে স্কুলটির সূচনা করেছিলেন।

ঐ আবেদনপত্র প্রকাশের পাঁচ সপ্তাহ পরেই কলকাতা শহরে ওয়ালিউল্লাহ লেনে স্কুলটি চালু হয় (লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত করার আগে কিছুদিন ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেনেও স্কুলটি চালু ছিল)।

দি মুসলমান-সম্পাদক সমীপে লেখা এই আবেদনে মুসলমান সাধারণের অবগতির জন্য রোকেয়া জানান যে, কড়াকড়িভাবে পর্দার (“ইন স্ট্রিক্ট অবজারভেন্স অব পর্দা”) ব্যবস্থা করে তিনি মেয়েদের জন্য একটি স্কুল শুরু করতে ইচ্ছুক। রোকেয়া লিখলেন, আমার প্রিয়তম স্বামী মরহুম সাখাওয়াত হোসেন বি. এ. নারীশিক্ষার জন্য দশ হাজার টাকা দান করে গেছেন। ঐ অর্থের

আয়ই (বার্ষিক ছয় হাজার টাকা) কেবল ব্যয় করবো না, আমি আমার নিজের সকল শক্তি ও সময় স্কুল পরিচালনায় নিয়োজিত করবো। কিন্তু স্বামী-প্রদত্ত ঐ তহবিল যথেষ্ট না-হওয়ায় তিনি দানশীল মুসলমান জনসাধারণকে এই প্রকল্প সফল করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়ানোর আবেদন জানান।

যে সব মুসলমান বোন এই আপোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, রোকেয়া তাঁদেরকে ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনের বাড়িতে আলোচনার আমন্ত্রণ জানান। যাঁরা ঠিকানা জানিয়ে খবর দেবেন, তাঁদের সঙ্গে রোকেয়া নিজে দেখা করে আলোচনা-বৈঠকে বসতে রাজি বলেও ঐ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

আর. এস. হোসেন-স্বাক্ষরিত 'করেন্সপন্ডেন্স' কলামে ১৯১৩ সালের ১০ জানুয়ারি সংখ্যা দি মুসলমান-এ মুদ্রিত পত্রের বিষয় মফস্বলের মেয়েদের সুবিধার জন্য স্কুল সংলগ্ন একটি ছাত্রীনিবাস স্থাপনের পরিকল্পনা। এই পত্রে রোকেয়া জানান যে, তাঁদের স্কুলে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দান করা হয় তবে যারা বাংলা ও ইংরেজির মাধ্যমে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য বাংলা ও ইংরেজি শেখাবার আলাদা নিয়মিত ক্লাশ শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, স্কুলের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজেই সরকারি মঞ্জুরি পাওয়া গেছে। তবে একটি শর্তে — জনসাধারণের কাছ থেকেও ভাল অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করতে হবে।

রোকেয়া স্বীকার করেন, তাঁর সাহায্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান সমাজের কাছ থেকে তিনি উপযুক্ত সাড়া পাননি। স্কুলের দরকারি জিনিসপত্র ও গাড়িখোড়া কেনার জন্য আরো দুশো আশি টাকা সংগ্রহ করতে না-পেরে তাঁর মন দুঃখ ও হতাশায় ভেঙে পড়ে।

এই চিঠিতে পত্রলেখিকা উল্লেখ করেন যে, ছাত্রীদের একটি বাস কেনার অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি মাসখানেক আগে দি মুসলমান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু বই কম-নামে বিক্রি করবেন বলে। তিনি জানান রমজান মাসে মাত্র ছয় টাকার বই বিক্রি হয়েছে। ইন্ডিয়ান ল রিপোর্টের এক সেটের নাম এক শো দুই টাকা আর রোকেয়া মাত্র একদশ টাকায় এই মূল্যবান সেটটি বিক্রি করে দিতে চেয়েছেন কিন্তু কেনার জন্য কোন লোক পাননি।

ঐ পত্রে রোকেয়া মুসলমান সমাজ সম্পর্কে দুঃখ করে বলেন, এসব লোক মেয়েদের একটি স্কুলের ভার গ্রহণ করতে পারে না, তারা আবার বিশ্ববিদ্যালয় চায়। তিনি লেখেন যে, কেউ সম্ভবতবে প্রস্তাব করতে পারেন, যে সম্প্রদায় মেয়েদের শিক্ষাকে অবহেলা করে তাদের আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কি প্রয়োজন?

রোকেয়া ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, আপনারা সমাজ থেকে মেয়েদেরকে বিতাড়িত করতে পারছেন না বা অতীতকালের আরবদের মতো আপনাদের কন্যাদের জ্যান্ত কবর দিতে পারছেন না।

পত্রিকার একই সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে রোকেয়ার ত্যাগের ও শ্রমের উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করা হয় যে, সরকার সতেরো শো টাকার মতো অনুদান দিয়েছেন কিন্তু ছাত্রীদের বাস ও অন্যান্য উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয়নি।

সংকলিত রচনাসমূহের তৃতীয়টি একটি প্রতিবাদপত্র। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে জনাব আর. (রফিকুর) রহমানের এক পত্রে প্রকাশিত অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন রোকেয়া। জনাব রফিকুর রহমানের অভিযোগপত্র মুদ্রিত হয়েছিল ২৫ মে ১৯১৭ সংখ্যায়। রোকেয়া তার জবাব দেন ছ-মাস পরে ৩০ নভেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায়।

"এডুকেশন অব বেঙ্গলি-স্পিকিং মোসলেম গার্লস" শিরোনামে প্রকাশিত ঐ চিঠিতে জনাব রফিকুর রহমান এই মর্মে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, কলকাতায় বাংলাভাষীরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান মেয়েদের বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এমন কোন স্কুল নেই। তিনি বলেন, বাঙালি মুসলমান মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র কোনও বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে আর দেরি না-করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

এর জবাবে রোকেয়া "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" শিরোনামে যে পত্র লেখেন তার মর্ম : আমি সাত বছর যাবৎ এই শহরে বাস করছি। এই সময়ে বেশ কিছুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাউকেই আমি বাংলায় কথাবার্তা বলতে শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। যদিও তাঁদের মুখে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ও ভুল উর্দু

শুনেছি। আমি তাঁদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা শুরু করেছি কিন্তু তাঁরা উর্দুতে জবাব দিতেই আগ্রহী। বাংলার অধিবাসী হয়েও বলেন যে, তাঁরা বাংলা ভুলে গেছেন। তাঁর কেবল খারাপ উর্দু বলতে পারেন কিন্তু তবু তাঁরা উর্দুতেই বলবেন।

রোকেয়া তাঁর আলোচ্য সুদীর্ঘ প্রতিবাদলিপিতে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পনেরো যোলাটি ছাত্রী নিয়ে ওয়াশিংটন লেনে যখন তাঁর স্কুল শুরু করেন তখন তিনি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়াতেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় করার জন্য ইংরেজি শব্দের অর্থ বাংলায় বুঝিয়ে কলার রীতি প্রবর্তন করেন। অচিরেই ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসতে থাকে ইংরেজি বোঝাবার জন্য যেন মাধ্যমরূপে উর্দু ব্যবহার করা হয়।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককালে কলকাতায় যে দুই-তিনটি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, সেখানেও উর্দু মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হয় কারণ অভিভাবকরা উর্দুকেই বেশি পছন্দ করেন বলে রোকেয়া উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেছেন, বিগত কয়েক বছর ধরে সরকার ব্যস্কা ও বিবাহিতা পর্দানশিন মুসলিম পরিবারের মেয়েদের পড়া, লেখা ও সূচিকর্ম শেখাবার জন্য ছয় জন উর্দুভাষী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করেছেন। ঐ শিক্ষয়িত্রীরা বোরকা পরে তাঁদের ছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে পড়ান। তাঁরাও উর্দুই পড়ান, বাংলা নয়। কিন্তু বাংলাভাষী ছাত্রীদের উর্দু পড়ানোতে কেউ কোন অভিযোগ করেননি।

রোকেয়া প্রশ্ন উত্থাপন করেন, বাংলা শেখার চাহিদা থাকলে সরকার কেন বাংলার পরিবর্তে উর্দু শেখাচ্ছেন? এর কারণ, রোকেয়ার মতে, কলকাতায় পর্দানশিন মুসলমান মেয়েরা বিনা বেতনেও বাংলা শিখতে চায় না। কলকাতার মুসলমান জনসাধারণ যদি বাংলা স্কুল চাইতেন তবে এত বছরেও এরকম একটি স্কুল স্থাপিত হয়নি কেন—এই প্রশ্ন করে রোকেয়া বলেন, এটা অবশ্যই ঠিক নয় যে, আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য বাংলার পরিবর্তে উর্দু শেখাচ্ছি।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের (১৯১৬) আয়োজন করার সময় রোকেয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বাংলায় কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবেন। বাংলা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য চার

পাঁচ জন ছাত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন বাঙালি শিক্ষয়িত্রীকে। এক সপ্তাহ পরে ঐ শিক্ষয়িত্রী বলেন, কোন ছাত্রীই বাংলা বলতে পারে না। রোকেয়া বলেন, এটা কি করে সম্ভব? কলকাতার মেয়েরা বাংলা বলতে পারে না? ঐ শিক্ষয়িত্রী জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, ওরা এক রকমের বাংলা পারে, তবে আপনি নিজে শুনে বিচার করুন।”

বাংলা বলতে ও বুঝতে পারে এমন অল্প কয়েকজন ছাত্রীকে নির্বাচন করা হলো। এক সপ্তাহ পরে আবার ঐ শিক্ষয়িত্রী জানালেন যে, মেয়েরা যদিও কবিতা মুখস্থ করেছে, তাদের উচ্চারণ খুবই খারাপ ও বিদেশীদের মতো।

রোকেয়া ইউরোপীয় মহিলাদের অভ্যুত উচ্চারণে বাংলা বলতে শুনেছেন কিন্তু তিনি দেখলেন বাঙালি মেয়েদের উচ্চারণ তাদের মতো না-হলেও এরাও কিছুটা বিদেশীদের মতোই উচ্চারণ করে। তিনি আবার নতুন ছাত্রী নির্বাচন করলেন এবং বহু চেষ্টা করে পুরস্কার-বিতরণ-অনুষ্ঠানের জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিলেন। কিন্তু তারা কিছুতেই “কত পাখি” উচ্চারণ করতে পারলো না। উচ্চারণ করে “কোতো পাখি” এবং “বণিকের বালা”-কে উচ্চারণ করে “বণকের বালা”।

এই সুদীর্ঘ প্রতিবেদনপত্রে রোকেয়া তাঁর স্কুলে বাংলা শাখা পরিচালনায় এক বছরের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ছাত্রীর অভাবে হয়তো পরের বছর থেকে তাঁর স্কুলে বাংলা শাখাটি বন্ধ করে দিতে হবে।

কলকাতার বাঙালি মুসলমান অভিভাবকদের তাদের কন্যাদের বাংলা শেখাবার ব্যাপারে অনীহা, এবং রোকেয়ার ক্ষোভ, হতাশা, উৎকর্ষা, বিরক্তি ও অসহায়তার পরিচয় ফুটে উঠেছে ২০ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে লেখা এই নিবন্ধপ্রায় পত্রে। একই ধরনের একটি চিঠি সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতেও মুদ্রিত হয়েছে বলে তাঁর এক বছর পরের আরেক চিঠিতে জানা যায়।

এক বছর পরে, ১১ ডিসেম্বর ১৯১৮ রোকেয়া একই বিষয়ে আরো একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি ২০ ডিসেম্বর ১৯১৮ সংখ্যা দি মুসলমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে রোকেয়া তাঁর স্কুলে ছাত্রীর অভাবে ১৯১৯-এর

জানুয়ারি থেকে বাংলা শাখাটি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেন।

বাংলা ভাষার প্রতি কলকাতার বাঙালি মুসলমানদের মনোভাব সম্পর্কে রোকেয়া আট বছর পরে ১৯১৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ওয়াই ডবলু সি এ হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত ভাষণে উল্লেখ করেন,

যোল বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন — অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়।

১৯১৯-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি রোকেয়া একটি বিবৃতি প্রদান করেন, সেটি প্রকাশ পায় দি মুসলমান পত্রিকায় ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। আবার ১লা এপ্রিল এক চিঠি লেখেন তা মুদ্রিত হয় ৪ এপ্রিল সংখ্যায়।

উপর্যুক্ত বিবৃতি ও সম্পাদককে লেখা চিঠির বিষয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লেডিজ কনফারেন্সের স্থান নির্বাচন নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিরোধ।

আনজুমানে খাওয়াতিনে ইসলামের (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৬) সম্পাদিকা ছিলেন রোকেয়া। তাঁর আগ্রহে নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন কলকাতায় আহূত হয় ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহে। অধিবেশনের আয়োজন ও প্রস্তুতির জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন রোকেয়া।

৮ রিপন স্ট্রিটের আরিফ ভামের বাড়ি মেলেভিল হাউস সংলগ্ন লানে অধিবেশনের স্থান নির্ধারিত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। আমন্ত্রণলিপি বিলির দু'দিন পরে ও অধিবেশনের নির্ধারিত তারিখের তিন দিন আগে নাজিরি বেগম (মিসেস সুলায়মান আরিফ) এক চিঠিতে জানান যে, মিসেস ভামের বাড়িতে সম্মেলনের সভা অনুষ্ঠিত হলে আনজুমানের কয়েক জন সদস্য অধিবেশনে যোগদান করবেন না। মুসলিম লেডিজ কনফারেন্সের অবৈতনিক সম্পাদিকা নাকিস দুলহান অনিয়মতাত্ত্বিকভাবে গল্‌স্টুন পার্কে অধিবেশন আয়োজন করে

বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। অভ্যর্থনা সমিতি তাঁর এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নীরবে না-মেনে-নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অধিবেশনের দিন সকালে দু-শোর বেশি মুসলমান মহিলা এসব কিছু-না-জেনে রিপন স্ট্রিটে রোকেয়ার সঙ্গে দেখা করেন। সব কিছু শোনার পর তাঁরা গল্‌স্টুন পার্কের সম্মেলনে না-গিয়ে বাড়ি ফিরে যান। দু-দিন পরে রিপন স্ট্রিটের প্যাভিলিওনে কলকাতার মুসলমান মহিলাদের এক সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় ছয় শোর বেশি মুসলমান মহিলা উপস্থিত হন। উপস্থিত ভদ্রমহিলাদের মধ্যে ছিলেন মিসেস আবদুল করিম, মিসেস এ. কে. ফজলুল হক, মিসেস কামালউদ্দিন আহমদ (শামসুল উল্লাহ), মিসেস আবুল কালাম আজাদ এবং আলিগড়, ভূপাল, বুলন্দশহর, গয়া প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মহিলা প্রতিনিধিবর্গ।

অধিবেশনের স্থান নিয়ে মতানৈক্যের কারণ হিসেবে রোকেয়া উল্লেখ করেন আরিফ ও ভাম পরিবারের (এরা বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়) বিবাদকে। বিবৃতিতে রোকেয়া উল্লেখ করেন, কয়েকটি সংবাদপত্রে গল্‌স্টুন পার্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের যে-খবর বেরিয়েছে তা সঠিক নয়।

তথ্যনির্ণয়

১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩; দ্বি-স. ১৯৮৪।
২. দি মুসলমান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠির অংশ আবুল ফজল প্রকাশ করেন তাঁর সাংবাদিক মুজিবুর রহমান বইয়ে (ঢাকা : 'বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭)। পরে ঐ চিঠির সম্পূর্ণ পাঠসমেত আরেকটি চিঠি এবং একটি অভিভাষণ — Educational Ideals for the Modern Indian Girls — প্রকাশ করেন ড. শামসুল আলম তাঁর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থে রোকেয়া ও তাঁর স্কুল সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়, নিবন্ধ, চিঠিপত্র এবং সংবাদাদিও সংকলিত।
৩. গোলাম মুরশিদ, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া/নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৭।
৪. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ।

উদ্ধৃত, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), “সম্পাদকের নিবেদন” রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দি-স. ১৯৮৪, পৃ. ১০।

৫. জুইয়া ইকবাল (সম্পাদিত) Selections from the Mussalman 1906-08, (কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৪) গ্রন্থে সংকলিত।
৬. বঙ্গীয় মুসলমান (১৮৯১) নামে বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি নবনূর, ইসলাম-প্রচারক, মিহির ও সুধাকর-এর লেখক ছিলেন। ম. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ম সং ১৩৯৫, পৃ. ১৩৮-৩৯।
৭. “বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি”, সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী, বর্ষ ২ সংখ্যা ৩২, ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯১-৯৪। সপ্তগাত চৈত্র ১৩৩৩ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত ও রোকেয়া রচনাবলীতে সংকলিত, পৃ. ২৮২। বার্ষিক সপ্তগাত-এ (১৩৩৩) “তিন কুঁড়ে” রচনায় রোকেয়া উল্লেখ করেন যে, আপাতত চল্লিশ জন বাঙালী শিক্ষার্থিনী ছাত্রী পাইলে সাধাওয়ারত মেমোরিয়াল বালিকা স্কুলে বাঙালী শাখা খোলা যাইবে। ম. রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৫৩১-এর পদটিকা।

বধিরকে শোনাতে হলে উচ্চকণ্ঠের প্রয়োজন

ভগৎ সিং

[সংসদ ভবনে বোমা নিষ্ক্ষেপের পর ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত লিফলেট আকারে টাইপ করা বক্তব্য বিতরণ করেন। এটি ভগৎ সিং লিখেছিলেন এবং টাইপ করেছিলেন। ঐ দিনই (৮ এপ্রিল ১৯২৯) এই লিফলেটটি হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।]

“বধিরকে শোনাতে হলে উচ্চকণ্ঠের প্রয়োজন”—একথা বলেছিলেন অসমসাহসী এক ফরাসী শহিদ। যে পরিস্থিতিতে তিনি এ-কথা বলেছিলেন, তেমনি এক পরিস্থিতিতে আমাদের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে আমরাও তাঁর কথাটিই প্রতিধ্বনিত করলাম।

গত দশ বছরের কীর্তি-কাহিনী, শাসন সংস্কারের ফলাফলের কথা নতুন করে বলতে চাই না। এই তথাকথিত ভারতীয় পার্লামেন্টের মাধ্যমে অপমানের যে দুর্বল ভার ভারতীয় জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করেও বলতে পারি, আমরা দেখছি, সাইমন কমিশন শাসন-সংস্কারের নামে কয়েকটি মাংসখণ্ড ছুঁড়ে দেবে : এই আশায় দেশবাসী কালনেমির লঙ্কাভাগ করতে বসে কলহ শুরু করেছে, আর সরকার পাবলিক সেকটি বিল, ট্রেড ডিসপিউটস্ বিল প্রভৃতির মাধ্যমে নতুন নতুন দমনমূলক ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। পাবলিক সিভিসন বিলটি রাখা হয়েছে আগামী অধিবেশনের জন্য। আইনি সীমার মধ্যে কাজ চালাচ্ছেন এমন সব শ্রমিক-নেতাদেরও যেরকম ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে হাওয়া কোনদিকে বইবে তা পরিষ্কার।

এই চরম উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে, ঘটনার পূর্ণ দায়িত্ব উপলব্ধি করে, সমস্ত দিক গভীরভাবে চিন্তা করে, সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হিন্দুস্থান

রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন দলের সামরিক বিভাগকে এই এ্যাকশনের নির্দেশ দিয়েছে যাতে পার্লামেন্টের এই অপমানজনক প্রহসনটি বন্ধ করা যায়। অতঃপর, বিদেশি আমলাতন্ত্র বা অভিরূচি তাই করুক, তার কীর্তিই জনসমক্ষে তার আসল চেহারা নথরূপে প্রকাশ করে দিক।

এই আইনসভায় যারা জন প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন তাঁরা নিজের নিজের এলাকায় ফিরে যান এবং মানুষকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করেন। পাবলিক সেকটি বিল, ট্রেড ডিসপিউটস্ বিল এবং লালাজীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার বিরুদ্ধে অসহায় ভারতবাসীর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার সাথে সাথে ইতিহাস বারবার যে শিক্ষাটি তুলে ধরেছে, সেই শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে আমরা বলতে চাই—একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সহজ, কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায় না। বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য ধূলায় মিশে যায় কিন্তু আদর্শ বেঁচে থাকে। বুরবৌ রাজবংশের বিনাশ ঘটেছে, জারতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অপ্রতিহত অগ্রগতির বিজয়কেতন উড়িয়ে এগিয়ে চলেছে বিপ্লব।

মানবজীবন আমাদের কাছে মহান। আমরা সেই ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখি, যেদিন মানুষের জীবনে আসবে পূর্ণ স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ শান্তি। এতদ্ সত্ত্বেও মানুষের রক্ত ঝরাতে আমরা বাধ্য হলাম, গভীর বেদনার সঙ্গে এ-কথা আমরা স্বীকার করছি। যে মহান বিপ্লব মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমস্ত মানুষের জন্য স্বাধীনতা এনে দেবে, সেই মহান বিপ্লবী যজ্ঞে কিছু ব্যক্তির জীবন আর্জিত দিতেই হয়—এ এক অনিবার্য সত্য।

—ইনকিলাব জিন্দাবাদ

গণতন্ত্র ও সামাজিক রূপান্তর : আশ্বেদকরের অন্তর্দৃষ্টি

ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে যে মানুষটির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তিনি হলেন বাবাসাহেব ভীমরাও আশ্বেদকর। আজ ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্র শুধুমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ ও রাজনৈতিক পাল্লাবদলের মধ্যেই আটকে থেকে গেছে। কিন্তু বাবাসাহেব অন্যরকম চেয়েছিলেন, অন্যরকম ভেবেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক গণতন্ত্র যেখানে থাকবে সবার জন্য সমান সুযোগ ও ন্যায়বিচার। গণতন্ত্র সম্পর্কে বাবাসাহেব আশ্বেদকর-এর ধ্যান-ধারণা ও ভাবনা সম্পর্কে লিখছেন আনন্দ তেলতুঙ্গলে।

ভাষান্তর : উৎসাহ আহমেদ

গণতন্ত্র সম্বন্ধে বাবাসাহেব আশ্বেদকরের ধারণা ও প্রত্যাশা ঠিক কী ছিল। আমাদের একটা সাধারণ ধারণা হল, পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব এবং বিপ্লবের জন্য রক্তপাত অবশ্যস্বাভাবী। এও মনে করা হয় যে, বিপ্লব আর গণতন্ত্র বিপরীতমুখী। আবার গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হল, এটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের এমন এক পদ্ধতি, যেখানে নিয়মিত নির্বাচন, বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সংবিধানে প্রতিটি ব্যক্তির সমান রাজনৈতিক মূল্য সুনিশ্চিত রয়েছে। আশ্বেদকর, গণতন্ত্রের এই তথাকথিত কাঠামোর মূল স্থপতি হিসেবে পরিচিত হলেও গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা অনেকটাই আলাদা ছিল। তাঁর কাছে গণতন্ত্র, ‘স্বাধীনতা, সমতা, সৌভ্রাতৃত্বের’ সঙ্গে সমার্থক, আদর্শ সমাজ গঠনের হাতিয়ার। সামাজিক পরিবর্তন সাধনের উপায় ও ফল।

গণতন্ত্রের প্রতি আশ্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি : সুদূর অতীত থেকে বর্তমানের আধুনিক সময়—গণতন্ত্রের ধারণা সবক্ষেত্রেই সরকারকেন্দ্রিক। উপরে যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে, তাতে আশ্বেদকরও একই কথা বলেছেন। কিন্তু এই ধারণাকে অনায়াসে ছাপিয়ে গিয়ে আশ্বেদকরই আবার বলেন, “গণতন্ত্র শুধুমাত্র সরকারের একটা ধরন নয়। এটা আসলে সংযুক্তভাবে বেঁচে থাকা এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা

বিনিময়ের এক পদ্ধতি, যার অপরিহার্য অঙ্গ হল সহনাগরিকদের প্রতি ভালোবাসা মেশা এক দৃষ্টিভঙ্গি। সৌভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্রেরই আর এক নাম।"

আন্দোলনের মতে, গণতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত হল গণতান্ত্রিক সামাজিক শাসনব্যবস্থা চাইলে আগে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে হবে। সামাজিক গণতন্ত্র না থাকলে গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাঠামো রাজনৈতিকরা বুঝতেই চান না যে, সরকারের কাঠামো নয়, গণতন্ত্র আসলে ধরনের সমাজব্যবস্থা। এর দুটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকা দরকার। প্রথমটি হল দৃষ্টিভঙ্গিগত। সহনাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সাম্যের মনোভাব। দ্বিতীয়টি সামাজিক সংস্থাগুলিকে গোড়া সামাজিক বিধিনিষেধের উর্ধ্বে উঠতে গণতন্ত্রের বসবাস বিচ্ছিন্নতা ও প্রান্তিকতায় নয়। একদল মানুষের নানা অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে, অন্যদের থাকবে না—এমন পার্থক্য গণতন্ত্রে চলতে পারে না।"

সামাজিক গণতন্ত্রের ধারণায় সাধারণত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরপন্থার একটি বিশ্বাসও এর অন্তর্ভুক্ত। আন্দোলনের কাছে কিন্তু এর অর্থ বিচ্ছিন্নতা, প্রান্তিকতা ও বৈষম্য সমাজ। ভারতীয় সমাজ এবং তার জাতিপাত প্রথার নিকে লক্ষ রেখে আন্দোলন 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র' নামে নতুন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হল বস্তুনিষ্ঠ ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির সমান অধিকারকে স্বীকার করা। অর্থাৎ আন্দোলন চিন্তায় গণতন্ত্র তিনটি পর্বে বিভাজ্য। রাজনৈতিক গণতন্ত্র বা গণতন্ত্র শাসনব্যবস্থা, সামাজিক গণতন্ত্র বা সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। "স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের" বৈশিষ্ট্যগুলে উল্লেখ্য যে আন্দোলন সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেন, এগুলি তারই অঙ্গ।

সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি : গণতন্ত্রে রাজনৈতিক শাসনের নিয়মতন্ত্র হল সংবিধান। খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান থাকার সুবাদে আন্দোলনকে ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি বলা হয়। কিন্তু এটা জানা দরকার যে, সংবিধানের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। আন্দোলনকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, কারণ তিনি মনে করতেন, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেজন্যই তিনি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো

পুনর্নির্মাণ করে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে সংখ্যাধিকার সমর্থনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক গণতন্ত্র তাকে পালটে না ফেলতে পারে। উদারনৈতিক মতবাদের মতবাদের দৃষ্টি দুর্বল। আন্দোলনের উদারনৈতিক মতবাদের অনুসারী হয়েও তিনি গণতন্ত্রের উদারবাদের মধ্যে একটি সীমা নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি মনে করতেন, বেসরকারি উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি, গণতন্ত্রের শর্ত ভঙ্গ করে। বেসরকারি সংস্থা চায় সম্পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা। এর ফলে অন্যদের অধিকার খর্ব হয়। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নামতে পারেন। নিয়োগকর্তা যত অন্যায়ই করুন না কেন, চাকরি চলে যাবার ভয়ে চাকরী ত্যাগ নিয়ে প্রস্তুত হতে পারেন না। আন্দোলনের ভাষায়, "বেসরকারি উদ্যোগ ওপর নির্ভরশীল সামাজিক অর্থনীতির চরিত্র কেউ যদি খতিয়ে দেখেন, তিনি বুঝতে পারবেন কীভাবে একে একে ব্যক্তিগত অধিকার শুধু খর্বই হয় না, বহু ক্ষেত্রে তা অধীকারও করা হয়। অথচ এরই উপরে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি স্থাপিত।" তিনি চাইতেন জীবিকা অর্জনের জন্য নিজেদের অধিকার বিসর্জন দিতে? নিজেদের পারবেন বেসরকারি নিয়োগকর্তাদের মর্জিমারফিক নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে?"

গণতন্ত্রের ক্ষুরশে তিনি চাইলেন উৎপাদনের উপাদানের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। ১৯৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর গণপরিষদে জওহরলাল নেহরুর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবে আন্দোলনকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় তিনটি পক্ষের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। "সামাজিক অর্থনীতি ছাড়া ভবিষ্যতের কোনও সরকার কীভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় সুনিশ্চিত করতে সমর্থ হবে। তা আমার বিশ্বাস নয়।"

এই একই দাবি তিনি তুলেছিলেন গণপরিষদে তপশিলি জাতি ফেডারেশনের ক্ষেত্রে। আন্দোলনকে 'সংবিধানে লিখিত আইনের অঙ্গ' হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, ভারী ও মৌলিক নিয়ন্ত্রণ নাগরিক এবং তা চালাবার অধিকার রাষ্ট্রের। একমাত্র রাষ্ট্রই বিমা ব্যবসা চালাতে পারবে। প্রত্যেক সাবালক নাগরিককে তার বেতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য

রেখে বাধ্যতামূলকভাবে বিমা করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রের ভারও রাষ্ট্রের হাতেই থাকবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কৃষিজমি ব্যবহার করার জন্য রাষ্ট্র ব্যক্তিকে জমির মূল্যের সমান দামের ভিবেঞ্চার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেবে। কৃষিক্ষেত্রকে গড়ে তোলা হবে সমবায় প্রথায়। রাষ্ট্রের মালিকানাধীন কৃষিজমি, গ্রামবাসীদের লিজ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে জাতপাতের কোনও বৈষম্য করা হবে না।

‘স্টেটস্‌ অ্যান্ড মাইনরিটিস্‌’ (‘রাজ্য ও সংখ্যালঘুরা’) শীর্ষক প্রবন্ধে আশ্বেদকর তাঁর এই পরিকল্পনা বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, গণপরিষদ আশ্বেদকরের এই ধারণা গ্রহণ করেনি। এর কিছুটা অংশ সংবিধানের চতুর্থ পর্বে নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা বাধ্যতামূলক নয়। গত ষাট বছরের ইতিহাস খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, আমাদের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কখনওই এই নির্দেশমূলক নীতিগুলির অনুসরণ করা হয়নি। যেমন ধরুন, বিশ্বায়নের সম্পূর্ণ প্যাকেজই তো এই নীতিগুলির বিরোধী।

শেষ আশ্রয় বৌদ্ধ ভাবনায় : ড. আশ্বেদকরের চিন্তাভাবনা ও দর্শনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল গণতন্ত্রের নীতিগত মাত্রার ওপর গুরুত্ব আরোপ, যাকে তিনি ‘নৈতিকতা’ আখ্যা দিয়েছেন। এর একটি দিক হল ‘সাংবিধানিক নৈতিকতা’, যার অর্থ কেবল সংবিধানের আইনি সংস্থানকে গুরুত্ব না দিয়ে তার মূল ভাবনার ওপর জোর দেওয়া। আশ্বেদকর মনে করতেন, স্বাধীনতা ও সাম্য অর্জনে নৈতিকতা অপরিহার্য। নৈতিকতা না থাকলে দুটিমাত্র বিকল্প থাকে। নৈরাজ্য অথবা পুলিশ। নির্বাচনী রাজনীতি, আধুনিকীকরণ বা উদারবাদী গণতন্ত্রে নয়, একমাত্র ব্যক্তিমানসের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সামাজিক রূপান্তরের সুফল পাওয়া সম্ভব বলে তাঁর বিশ্বাস। এই যুক্তিবোধের তাগিদেই তিনি ১৯৩৫ সালে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন এবং ১৯৫৬ সালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। মাত্রের ২০ বছর ধরে অনুসন্ধান চলে এমন এক ধর্মমতের, যা ‘স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব, এককায় গণতন্ত্রের’ সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের মাত্র দু মাসের মধ্যে তাঁর জীবনাবসান হয়।

গণতন্ত্রের লক্ষ্যে ভারতের যাত্রা : গণতন্ত্রের পীঠস্থান হওয়া সত্ত্বেও ভারত বেছে নিয়েছিল ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে তৈরি বন্ধে প্রান অনুসারে স্বাধীন ভারতের প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। ভূমি

সংস্কার ও সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতকে পরিকল্পিতভাবে ধনতন্ত্রের সূতিকাগৃহে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। নিম্নবর্ণের মানুষজনকে সহায়তার অভ্যুত্থানে ধনতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় জাতপাত প্রথার পুনরুজ্জীবন ঘটানো হল। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ভারতে এই সবার অনুপস্থিতিতে গণতন্ত্র বলে যা পড়ে রইল তা হল নিয়মিত নির্বাচনের শূন্যগর্ভ প্রথা।

ছয় দশক পরেও এখনও আমরা দেশের মানুষের ক্ষুধা মেটাতে পারিনি। দেশে দারিদ্র্যের হার নিয়ে আমরা যখন তর্ক করি তখন ভুলে যাই, ভারত বিশ্বের অনাহারাক্রান্ত দেশগুলির অন্যতম। তার স্থান এমনকী সুদান, পাকিস্তান বা নেপালেরও পরে। দেশের জনসংখ্যার ২১ শতাংশ অপুষ্টিতে আক্রান্ত, পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের ৪৪ শতাংশ-এর ওজন স্বাভাবিকের নীচে। তাদের ৫ শতাংশের মৃত্যু হয় পাঁচ বছরে পৌঁছানোর আগেই। বুদ্ধির বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে ভারতেই সবথেকে বেশি। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা সংস্থা—IFPRI বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে (গ্লোবাল হাঙ্গার ইণ্ডেক্স) অপুষ্টির দিক থেকে বিশ্বের সবথেকে তলায় থাকা ৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৬৭তম। কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা, নিরক্ষরের সংখ্যা, শৌচালয় না থাকার প্রকাশ্য স্থানে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারেন এমন মানুষের সংখ্যা, বিপুল পানীয় জলের সংস্থান নেই এমন মানুষের সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে ভারতেই সবথেকে বেশি।

নিয়মিত নির্বাচন হওয়ায় ভারত গণতন্ত্রের বড়ই করে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত কষ্টের শুনতে পাওয়ার নিরিখে বিচার করলে ভারতের স্থান হবে বিশ্বের সবথেকে অগণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে। ভারতীয় মিডিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে স্বাধীনতা ও উজ্জ্বলতার প্রতিফলন দেখা যায় বটে, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে বহু সাংবাদিকই সাধারণ মানুষের কষ্টের জোরালোভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হন। রাজনৈতিক গণতন্ত্রেরই যেখানে এই হল, সেখানে আশ্বেদকরের স্বপ্নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র যে সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অন্তরালে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতপাতের সমস্যা এখন আরও বেশি করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। প্রতি বছর ৩০ হাজারেরও বেশি দলিত নির্বাসনের ঘটনা ঘটে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গত তিন দশক ধরে আর বৈষম্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে। GINI সূচক .৫৫-

এরও বেশি হওয়ায় ভারতীয় সমাজ বিশ্বের সবথেকে বেশি বৈষম্যপূর্ণ সমাজগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় সমাজ সমাজতান্ত্রিক যে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল, আজ বিশ্বায়নের দাপটে তা মুছে গেছে। ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশহার বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু অনেকে তাকে 'হিন্দু বিকাশহার' আখ্যা দিয়েছেন। এর জেরে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং শক্তিবৃদ্ধি হলেও, নীচ জাতের মানুষজন সেই তিমিরেই রয়েছেন। বিকাশহারকে সুস্থিত রাখতে অন্য যে মাপকাঠিগুলির উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল, উদ্ভাদনার চোটে সেদিকগুলিতে নজর দেওয়া হয়নি। আজ সেই অস্তঃসারশূন্যতা ফুটে বেরোচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতির হারকে নিয়ে যে আর্থিক দুরবস্থার সূচক (ইকনমিক মিজারি) তৈরি হয়, তার দিকেই তাকানো যেতে পারে। 'ত্রিক' দেশগোষ্ঠীর মধ্যে এক্ষেত্রে ভারতের সূচক ১৭.৮, যেখানে চিনের ৯.১।

মজার কথা হল, আবেদকরের চিন্তাভাবনা ও দর্শনকে যত বেশি করে উপেক্ষা করা হয়েছে, ততই তাঁকে উন্নীত করা হয়েছে দেবদেব আসনে। সংবিধানের সক্রিয় অংশ হিসেবে যেগুলি তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েও পারেননি, সেই নির্দেশমূলক নীতিগুলি নীরব সাক্ষী থেকেছে রাষ্ট্রের এই বিপরীতমুখী গতির। তবে তাঁর উচ্চারিত সেই সতর্কবাণী আজও কানে বাজে।

“১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমরা স্ববিরোধিতার এক জীবনে প্রবেশ করতে চলেছি। আমাদের রাজনীতিতে সাম্য থাকবে, অখচ্ছ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে থাকবে বৈষম্য। যত দ্রুত সম্ভব, এই স্ববিরোধিতার অবসান আমাদের ঘটাতেই হবে। না হলে বৈষম্যের শিকার যারা হচ্ছেন, তাঁদের রোয়ে এই গণপরিষদের এত ঘরে তৈরি গণতান্ত্রিক কাঠামো ধুলিসাং হয়ে যাবে।”

এই সতর্কবাণী গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

□

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সম্পর্কে

গ্রন্থালোচনা : জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার

সহযোগিতায় দেবী চ্যাটার্জী

কেউ বলেন নায়ক, কেউ বলেন খলনায়ক, বাকিরা এবং তাঁরাই সংখ্যায় বেশি, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে স্থান দিতেই নারাজ। একেই বোধ হয় বলে, ইতিহাসের বিড়ম্বনা।

সম্প্রতি এক জাপানি গবেষকের লেখা একটি নিবন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখে স্বাভাবিক ভাবেই অবাক হয়েছিলাম, কারণ ভারতীয় গবেষকদের রচনায় যোগেন্দ্রনাথের নাম কদাচিৎ চোখে পড়ে। যোগেন্দ্রনাথ ও তাঁর আন্দোলন বিষয়ে যে অল্প কিছু মানুষ গবেষণা করেন, তাঁদের মধ্যে পরিচিত কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, জাপানি ঐ গবেষকের নিবন্ধটির সম্পর্কে তাঁরা কেউই ওয়াকিবহাল নন। এই প্রসঙ্গে বলি, লেখাটি জাপানিতে লেখা নয়—ইংরাজিতে এবং ভারতীয় এক প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত এক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পাঠক ভাবতেই পারেন, এই প্রসঙ্গে আমি এতগুলি কথা কেন কললাম। কারণ দুটি। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে এতগুলি কথা কেন কললাম। কারণ দুটি। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে আলোচনার দাবী রাখতে পারেন, যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এহেন ধারণা ভারতীয় অনেক ইতিহাসের গবেষকের না থাকলেও বিদেশী কিছু গবেষকের অন্ততঃ আছে। বিদেশী স্বীকৃতির পর দেশীয় আগ্রহ সঞ্চারিত হওয়ার ঘটনা আমাদের দেশে কম নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে অমর্ত্য সেন পর্যন্ত তা দেখা গেছে। যোগেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এটা ঘটলে অবাক হবো না। তবে দেশীয় স্বীকৃতিটা (জ্ঞতি নয়) আগে এলে ভালো হত।

দ্বিতীয়তঃ, যোগেন্দ্রনাথ বিষয়ে যে অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ গবেষণা করেন, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যের অভাবে তাঁদের গবেষণার নানা ধরনের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। তাঁরা অনেক সময়েই জানতে পারেন না কী প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে, কোথায় গেলে তা সংগ্রহ করা যায় ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে বলি, যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেটুকু গবেষণা হয় তার অধিকাংশটাই করেন অবদমিত

জাতির, বিশেষতঃ, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কিছু স্বাধীন বা free lance গবেষক। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যপ্রাপ্ত গবেষকদের তুলনায় তাঁদের সমস্যাটি আরো জটিল; গবেষণা আরো কষ্টসাধ্য।

আশ্চর্য্য লাগে, কত সহজে আমরা অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী, পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভা-র অন্যতম সদস্য, ড. আবেদকরের বাংলা থেকে গণ-পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পিছনের ব্যক্তি এবং সর্বোপরি, স্বাধীনতার সময়কালে বাংলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রথম সারির নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে বিস্মৃতির আড়ালে ঠেলে দিতে পারি। সমগ্র জীবনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে লেখক সদানন্দ বিশ্বাস তাঁর জীবনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা পাঠক-সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের পারস্পর্য্য খুঁজতে এই ঘটনাগুলির প্রয়োজনানুগ বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় (মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ স্বকাল, স্বজাতি ও রাজনীতি) এবং তৃতীয় অধ্যায় (মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ত্রীমিশন ও পরবর্তী আন্দোলন)-এর নির্মাণ কৌশল, উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ লেখকের স্বকীয়তা ও দক্ষতা তুলে ধরেছে। এই সুবিশাল অধ্যায় দু'টিতে তিনি যেভাবে যোগেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন তা যোগেন্দ্রনাথকে বুঝতেই শুধু সাহায্য করবে না, কেন তিনি ভারতীয় রাজনীতির মূলপ্রাণ থেকে সরে গিয়ে নিজস্ব পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন তারও যথার্থ কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে তিনি প্রকৃত পক্ষে যোগেন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগে বাংলার অনুন্নত সমাজের, বিশেষতঃ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়েও (যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল: শতবর্ষের মূল্যায়ণ) তিনি সাইমন কমিশন ও পূণা চুক্তির সময়কার বাংলার অনুন্নত জনগোষ্ঠীর সুকঠিন রাজনৈতিক সংগ্রামের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। একালের শিক্ষিত তফসিলীদের অনেকেই এ-সংগ্রামের কথা জানা নেই। তাঁদের আজকের উন্নতির সোপান কী সুকঠোর সংগ্রামের ফলে যোগেন্দ্রনাথ-মুকুন্দবিহারী-রসিকলাল-অমূল্যধনেরা কিভাবে তৈরি করেছিলেন, তা তাঁদের একান্তভাবেই জেনে নেওয়া কর্তব্য। লেখক ইতিহাসের অন্ধকার অলি-গলিতে ঘুরে বাংলার

অস্তাজ সমাজের এই হারিয়ে-বাওয়া ইতিহাস উদ্ধার করে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বঙ্গভঙ্গের কথা। বাংলা ভাগের জন্য যে অকারণেই যোগেন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করা হয়, বাংলা ভাগের জন্য তিনি যে কোন ভাবেই দায়ী নন বরং যুক্ত বাংলার পক্ষে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে হলেও যে একটি শক্তিশালী আন্দোলন তৈরি করতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, লেখক এই অধ্যায়ে তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ভারত বিভাজন হয়েছিল দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির অদম্য লোভের ফলে এবং ধুরন্ধর বড়লাট মাউন্টবাটেনের অযৌক্তিক তৎপরতার ফলে। আর বাংলার বিভাজন হয়েছিল সেই বিভাজনের রাজনৈতিক স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে। বিভিন্ন প্রামাণ্য পুস্তক বেঁটে, তা থেকে যথোপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক শ্রী সদানন্দ বিশ্বাস তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু গুটিকতক এলোমেলোভাবে লেখা বাংলা পুস্তকের উপর নির্ভর করেননি। মেনন, মাওলানা আজাদ, ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ের, জয়া চ্যাটার্জী ও শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য লেখক-গবেষকদের লেখা ইংরেজি পুস্তকগুলি থেকে তাঁর গ্রন্থের প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সংগ্রহ করেছেন। শক্তিশালী কেমব্রিজ গবেষিকা জয়া চ্যাটার্জীর অনুকরণে লেখক শ্রী বিশ্বাসও বাংলা-বিভাজনের জন্য 'ভঙ্গলোক' হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকেই দায়ী করেছেন এবং বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত করে সেটিই তিনি যুক্তিযুক্ত ভাবে প্রমাণ করেছেন। হিন্দু-বাংলার অনেকের কাছেই এ তথ্য অভিনব মনে হবে—তাঁরা হয়তো এধরনের কথা শুনে আঁতকে উঠবেন। তবে আনন্দের কথা এই যে, লেখক কোন মনগড়া কথা বলেননি, কিংবা অনুমান-নির্ভর ইতিহাস রচনা করেননি—তাঁর বক্তব্যের পিছনে তিনি বিশেষজ্ঞ লেখক-গবেষকদের লেখা থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সহযোগে তা সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করেছেন। বাংলাভাগের প্রশ্নে একদিন যোগেন্দ্রনাথকে ঘিরে যে-বিতর্ক শুরু হয়েছিল, এই পুস্তকটি পাঠ করলে আশা করি বহুলাংশে সে বিতর্কের নিরসন ঘটবে।

লেখক তাঁর গ্রন্থখানিতে অজ্ঞত তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, অনেক মূল্যবান সারণী ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র সংযুক্ত করেছেন। যোগেন্দ্রনাথের

ঐতিহাসিক পদত্যাগ পত্রের নেপথ্য কাহিনী যদিও অনালোকিত রয়ে গেছে, তবে লেখক এই পদত্যাগ পত্র রচনার পেছনে ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেনের সহায়তার কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রের উল্লেখপূর্বক উল্লেখ করেছেন। এটি অবশ্যই তাঁর উজ্জ্বল আবিষ্কার। আর পরিশিষ্ট অংশে যোগেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক পদত্যাগ পত্রখানা জুড়ে দেয়া যথোপযুক্ত কাজ হয়েছে। যোগেন্দ্রনাথের শেষজীবন সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা থাকলে গ্রন্থখানি যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যথার্থই একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ হয়ে উঠতে পারতো। হয়তো প্রয়োজনীয় আকর গ্রন্থের অভাবে সেটি হয়ে ওঠেনি; ভবিষ্যতে এই শক্তিশালী গবেষক সেদিকে নজর দেবেন এবং পরবর্তী সংস্করণে মহাপ্রাণের শেষ জীবনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আরও একটি অধ্যায় যুক্ত করে তাঁর সুন্দর এই গবেষণাগ্রন্থের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করতে পারবেন বলে আশা করি। এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থটি যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দিক-নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করে থাকবে বলে দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি।

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ

সদানন্দ বিশ্বাস

দীপালি বুক হাউস

মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র

শহিদদের নাম তালিকায় বর্ণ ও বর্ণ-এর সম্পর্কের ছাপ

খোকন মজুমদার

জীবন বাজি রেখে যাঁরা ভারতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের উপাধি-পেশার সম্পর্ক লক্ষণীয়। তরাই ডুয়ার্সের শ্রমিক কৃষক বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলনে যে সব কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করে শহিদ হয়েছেন তাঁদের কিছু নাম ও পরিচিতি দেওয়া হল। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ ঘোষ, মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত, সমর গাঙ্গুলী ও বিমল দাসগুপ্ত এই তালিকা সম্পূর্ণ করার বিষয়ে সহযোগিতা করেন। উল্লেখ্য যে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আজ বয়সের ভারে ন্যাক, কেউ কেউ মারাও গিয়েছেন।

মৃত্যুবরণ করে শহিদ হয়েছেন

সরবর মহাম্মদ—(মনসুর হাবিবুর খোলান) তেভাগা চাই, সরবর মহাম্মদ এই প্রোগাম প্রথম দিলে কৃষকেরা ধানের লড়াইয়ে বাপিয়ে পড়ে। কৃষকেরা তাঁর ধনুক নিয়ে ঐ আন্দোলন পরিচালনা করে। ধানের লড়াই করতে গেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ডুয়ার্স এলাকার আধিবাসী। ভাল কর্মী।

হপনা মান্নি—একজন চা শ্রমিক। বাল গোবিন্দ জোতে একটি কাগজে 'পলাশির মাঠ' লিখে আমগাছে টাঙ্গিয়ে দেয়। উদ্দেশ্যে, লর্ড ক্লাইভ যেভাবে সিরাজের সাথে যুদ্ধ করেছিল, সেভাবেই তেভাগার জন্য জোতদারের সঙ্গে লড়াই করবে। মহাবাদী গয়ানাথ জোতে তেভাগা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ডুয়ার্সের বাসিন্দা। ভাল কর্মী।

বধু খাড়িয়া—ওদলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। মহাবাদী গয়ানাথ জোতে তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ভাল কর্মী।

কৃষ্ণ ওঁরাও—ওদলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। মহাবাদী গয়ানাথ জোতে

ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। জঙ্গী কর্মী।

রামু মুণ্ডা—ওদলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। মহাবাড়ী গয়ানাথ জোতে তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

বিরসা ওঁরাও—জঙ্গী কর্মী। চা শ্রমিক। মহাবাড়ী গয়ানাথ জোতে ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ডুয়ার্সের অধিবাসী।

এতোয়া ওঁরাও—ভাল কর্মী। ডুয়ার্স এলাকার বাসিন্দা। মহাবাড়ী গয়ানাথ জোতে তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

চাপড়া ওঁরাও—ভাল কর্মী। ওদলাবাড়ী চা বাগানের শ্রমিক। মহাবাড়ী গয়ানাথের জমির ধান তেভাগা করতে নিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

বেচগী খাড়িয়া—চা শ্রমিক। ডুয়ার্সের অধিবাসী। মহাবাড়ী গয়ানাথ জোতে ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

মহাম্মদ খলিল—ডুয়ার্সের অধিবাসী। ভাল কর্মী। মনসুর আলী খোলানে জোতদারের যড়যন্ত্রে নিহত হয়।

জিতুকুমার—ওদলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। ভাল কর্মী। ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

লোধরা বুড়া—ওদলাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। ভাল কর্মী। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

লছমন সিং—ভাল কর্মী। ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

সহরই মুণ্ডা—ভাল কর্মী। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

কিশোরীকর্ণ—ভাল কর্মী। ধানের লড়াইয়ে নয়, ১৯৪২ সালে সাপের কামড়ে মারায় যায়। রংপুরের ডোমারে যে কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে স্মৃতিরক্ষার্থে 'কিশোরী তোরণ' করা হয়েছিল।

মহিলা কর্মী

করমী ওঁরাওনি—ডুয়ার্স অঞ্চলের নেওরামাখালির বাসিন্দা। ভাল কর্মী। নেওরা মাখালিতে ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

বুধনি ওঁরাওনি—জঙ্গী কর্মী। গোলাপ ধান তেভাগা করতে গিয়ে পুলিশের

গুলিতে নিহত হয়। ডুয়ার্সের অধিবাসী।

স্বর্ণময়ী ওঁরাওনি—ভাল কর্মী। তেভাগা লড়াইয়ে জোতদারের যড়যন্ত্রে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ডুয়ার্সের অধিবাসী।

এতোয়ারী মুণ্ডা—ভাল কর্মী। ডুয়ার্সের বাসিন্দা। নেওরামাখালিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

আহত কর্মী

মাধবদত্ত—বোদা, পাঁচগড় ও দেবীগঞ্জ ধান এলাকায় কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যে ক'জন আদর্শবান তরুণ মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদেরই অন্যতম কমরেড মাধব দত্ত। জীবনের শেষ সুস্থ দিন পর্যন্ত মার্কসবাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। জন্ম ১৯১২ সাল। জন্মস্থান বরিশাল জেলার কাশীপুর শহরে। পিতা প্রয়াত রাসবিহারী দত্ত, মাতা প্রয়াত সরোজিনী দত্ত। নিজের অন্তরের টানেই রাজনীতিতে আসেন। প্রথমে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হন। পরে, খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গান্ধীগণ আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আধিয়ার আন্দোলনে জোতদারের যড়যন্ত্রে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন। জামিনে মুক্ত হলেও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ওই সময় শিলিগুড়িতে বন্ধুগৃহে আশ্রয় নেন। অকস্মে মাধববাবু শিলিগুড়ি থাকাকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঘটনাটি হ'ল, মাধববাবু তাঁর স্বভাব অনুযায়ী যত্রতত্র মার্কসবাদ আওড়াতে। একদিন এক চায়ের দোকানে চা পান করতে করতে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে এক সহ চাপায়ী তাঁকে জানালেন, শিলিগুড়ি মহকুমার কংগ্রেসের সভাপতির পুত্রও তো এইসব তত্ত্বকথা বলে থাকেন। কাল বিলম্ব না করে তিনি কংগ্রেস সভাপতির পুত্রের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলেন, সত্যিই ইনি মার্কসবাদ পড়াশুনা করেছেন এবং এই তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী। তখন মাধববাবু তাঁকে বললেন, তত্ত্বতো জানেন, বোঝেন, কিন্তু কী ফল, যদি আপনার এই তত্ত্ব জানকে আপনি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ না করলেন? আপনার কম্যুনিষ্ট পার্টির কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের কাজে যোগ দেওয়া উচিত। ব্যক্তিটি জানালেন, তিনি কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পাবেন কি ভাবে?

মাধববাবু তাঁর আন্তরিক আগ্রহ উপলব্ধি করে জলপাইগুড়ির কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্র দিলেন। তখন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল বে-আইনি এবং জেলা নেতৃত্ব ছিলেন শহরের বাইরে গোপন আশ্রয়। এরপর একদিন এই ব্যক্তিটি মাধববাবু প্রদত্ত সূত্র ধরে এক গ্রামে গিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের নির্দেশমত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। মাধববাবুর 'রিক্রুটেড' এই ব্যক্তিটিই হলেন নকসালবাড়ি আন্দোলনের স্রষ্টা কমরেড চারু মজুমদার। যিনি নিষ্ঠা ও সংগঠন দক্ষতার জন্য হয়ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একজন সাহসী সংগ্রামী মানবপ্রেমী রূপে উল্লেখিত হবেন। ১৯৮৫ সালে কমরেড মাধব দত্ত মারা যান।

বিদ্যাবর বর্মণ—গরীব কৃষক। দেবীগঞ্জ থানার পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। আধিয়ার আন্দোলনে জোতদারের গুপ্তা বাহিনীর হাতে আহত হন। পাঁচপীরে এস.ডি.ও'র গাড়ী উল্টানোর বিষয়ে বন্দি হন। সংগ্রামী কর্মী।

নন্দকিশোর বর্মণ—বৃদ্ধ কৃষক। ময়দান দীঘিতে পার্টি অফিসের জন্য চারবিঘা জমি দান করেছিলেন। আধিয়ার আন্দোলনে বৃদ্ধ নন্দকিশোরকে পুলিশ প্রচণ্ড মারধোর করে আহত করে। পুলিশ ময়দান দীঘির পার্টি অফিস ভেঙ্গে ওড়িয়ে দেয় এবং তাঁকে দিয়ে ওই জমি লাঙ্গল দিয়ে চাষ করিয়ে ঘষে ছিটিয়ে দেয়। দেবীগঞ্জ থানার অধিবাসী।

কেশবচন্দ্র দত্ত—কুচবিহার জেলার পাট গ্রামের অধিবাসী। তরাই ও ডুয়ার্সের আধিয়ার আন্দোলনে অংশ নেন এবং কুচবিহারে পুলিশের হাতে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন এবং সেখানেই বিচার হয়।

পুরিয়া মানকি মুণ্ডা—ডুয়ার্সের বাসিন্দা। জঙ্গী কর্মী। ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলি পায়ে লেগে আহত হয়।

পাতরায় ওঁরাও—বালাবাড়ী চা বাগানের শ্রমিক। জঙ্গী কর্মী। গয়ানাথ জোতে তেভাগা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়।

হোসনা—জঙ্গী কর্মী। ডুয়ার্সের বাসিন্দা। ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়।

মঙ্গর ওঁরাও—ডুয়ার্সের অধিবাসী। তেভাগা সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে

আহত হয়।

ভুলন ওঁরাও—সাঁওগাঁ বস্তির বাসিন্দা। ধানের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়।

বুধু ওঁরাও—দক্ষিণ ওদলাবাড়ি বস্তির অধিবাসী। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়।

গুরা ওঁরাও—দক্ষিণ ওদলাবাড়ি বস্তির বাসিন্দা। তেভাগার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়।

মহিলা আহত কর্মী

পোকা ওঁরাও—জঙ্গী কর্মী। ডুয়ার্সের অধিবাসী। নেওরামাঝালিতে পুলিশের দলকে তাড়া করে পিছে হঠিয়ে দেবার সময় আহত হয়।

সুনীতি বর্মণ—জঙ্গী কর্মী। মালনদী এলাকার বাসিন্দা। তেভাগা করতে গিয়ে পুলিশের গুলি পায়ে লেগে আহত হয়।

অনুলেখন : উৎসাহ আহমেদ

□

সংখ্যালঘুকে নাগরিক অধিকারে নিশ্চিতি দানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের

আহমদ শরীফ

অরণ্য পর্বত-সমুদ্রের বাধা দুর্লভ্য ছিল বলে বিভিন্ন অঞ্চলে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে পরিচয় তথা যোগাযোগ এককালে সম্ভব ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীতে তথা ভৌগোলিক অবস্থানে জল-বায়ু-মাটি-তাপ অনুসারে রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যের সুলভতা ও দুর্লভতা অনুযায়ী জীবন-জীবিকার উপাদান-উপকরণ ছিল বিচিত্র ও বিভিন্ন। আকাশ-মাটি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নয় কেবল, সৃষ্টি-ঐশ্বর্য সম্বন্ধে, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ও স্থান কালভেদে বিচিত্র ও বিভিন্ন হয়েছে। সেই পার্থক্য, স্বাভাবিক, আচার, অভ্যাস স্বীকার ও সহ্য করে সহযোগিতায় সহাবস্থান করাই হচ্ছে সংস্কৃতি, সৌজন্য ও সভ্যতা। মিশরে, গ্রীসে, ইরাকে, ভারতে, চীনে, আফ্রিকার কালো মানুষের মধ্যে ঐশ্বর্য-সৃষ্টি, দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা প্রভৃতি অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তি সম্বন্ধে যে-সব সুপ্রাচীন ধারণা ছিল, সে-সব ধারণার রেশ ও লেশ আজো আমাদের বিশ্বাসে সংস্কারে ধারণায়, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে রয়ে গেছে। এ কারণেই আমরা আজও জ্ঞান-বিজ্ঞান বুদ্ধি-যুক্তি-বিশ্লেষণ-বিশ্লেষণ প্রয়োগে ভ্রান্ত-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সহজে অনুভব-উপলব্ধি করতে পারি না। তাই আমরা য য বিশ্বাসের সংস্কারের ধারণার শাস্ত্রের আচারের আচরণের স্বাভাবিকই সত্য বলে, প্রয়োজনীয় বলে, অস্তিত্বের ও পরিচিতির স্বাভাবিকতার জন্যে আবশ্যিক বলে জানি ও মানি। যদিও আমাদের আজকের যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে আমরা শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নানাভাবে প্রাত্যহিক জীবনে জীবনযাত্রায় সমকালীনতা রক্ষার গরজেই লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছি, হচ্ছে। এর ফলেই হয়তো আমরা প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠ মানব প্রজাতি বলে দাবি করলেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য অবিশেষে আজো রিপূর প্রভাব মুক্ত হতে পারিনি, সময়ে সময়ে ষড়রিপূর প্রভাবে হিংস্র স্থাপদের মতোই আচরণ করি। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে, লাভে লোভে স্বার্থে প্রলুব্ধ মানুষ পারে না, করে না হেন অপকর্ম নেই।

আহমদ শরীফ

৩। পৃথিবীতে কোথাও মানুষকে স্বপ্রজাতির প্রাণী হিসাবে মমতার সঙ্গে সম ও সহ স্বার্থে সংযমে, পরমত ও আচরণ সহিষ্ণুতায়ও সৌজন্যে সহযোগিতায় সহাবস্থানের স্বীকৃতির ভিত্তিতে বা চুক্তিতে গ্রহণ করতে পারেনি কোন সমাজই। প্রাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষকে কেবল 'মানুষ' হিসাবে বরণ করা সম্ভব হচ্ছে না আজও বন্ধ ও বন্ধ্য মনে মগজে মননে আমাদের মধ্যে কেবল শৈল্পিক, গৌষ্ঠিক, শাস্ত্রিক, আঞ্চলিক ও ভাষিক আর জৈবিক চেতনাই আদি ও আদিম কালের মতোই রয়ে গেছে। এতো বিন্যাস-বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-নীতিশাস্ত্র আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের, মানবিকত্বের অবশ্য বিকাশ ঘটতে পারেনি। তাই গোটা পৃথিবীব্যাপী আজো তিন 'R'-এর দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ-সংঘাত মানুষের মানবতার অপ্রতিরোধ্য অসমাপ্য সঙ্কট-সমস্যা হয়ে রয়েছে। আজ Racial, Religious ও Regional-দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্ব লড়াই চলছে বৈশ্বিক নরহত্যার আকারে।

আমরা জাত-জন্ম বর্ণ-ধর্ম, ভাষা-নিবাস যোগ্যতা নির্বিশেষে বাংলাদেশী মাত্রেরই বাংলাদেশী অঙ্গীকার করে এবং আদিবাসী উপজাতিদের বাংলাদেশী রাষ্ট্রের সম অধিকার প্রাপ্ত নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে এই সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। বেদনার কথা এই পাকিস্তান আমলে সংখ্যালঘুদের যত সুযোগ-সুবিধে ও জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আজ সংখ্যালঘুরা তত নিরুপদ্রব নিরাপদ নিশ্চিত জীবনের স্বস্তি পাচ্ছে না, লাভ-লোভ-স্বার্থ বশে গাঁয়ের প্রবল প্রলুব্ধ দুষ্টি দুর্জন দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতিকারীরা নাকি তাদের যে কেবল অবজ্ঞা-উপেক্ষা-অপমানিত করে, তা নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাত পেলেই হুকুম-হুমকি-হুম্মার-হামলা প্রয়োগে দ্বিধা করে না। স্বদেশে, স্বভিটের, স্বঘরে তাদের নিরুপদ্রব-নিরাপত্তা বিশেষভাবে অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে—সরকারী প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে মন্দির ভাঙার ও হিন্দুর অর্থ-সম্পদ লুট করার সময় থেকে বাবরী মসজিদ ভাঙার পরবর্তীকালে নতুন করে এবং দেশব্যাপী মন্দির ভাঙার, বাড়ি পোড়ানোর, অর্থ-সম্পদ লুটের পর থেকে। উটের পিঠে শেষ কুঁটোর মতো হিন্দুরা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ঢাকার জন্মান্তরী মিছিলের উপর আকস্মিক হামলার পরে। এ হামলার পরে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। আমরা চাই বাংলাদেশের নাগরিক রূপে

সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধে যোগ্যতানুসারে পাক, আর স্ব স্ব চিন্তা-চেতনা-মত প্রকাশের ও আচার-আচরণের স্বাধীনতা লাভ করুক। এ হচ্ছে কালের দাবি, মানুষের ও মনুষ্যত্বের দাবি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাহিদা।

উল্লেখ্য যে সেকুলার রাষ্ট্রছাড়া বিভিন্ন গোত্রিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক মানুষ কখনো সুবিচার পায় না, আমরা তাই সেকুলার গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রাপ্তির দাবিদার। এতেই দৈনিক বা রাষ্ট্রিক একক অভিন্ন জাতি-চেতনা গড়ে উঠবে, নইলে সংখ্যালঘুরা সুবিধে মতো জীবন-জীবিকার, অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চিতির অভাবে দেশ ত্যাগ করে ও করবে, দেশের অর্থ-সম্পদও পাচার করে ও করবে। এতে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি হয় ও হবে সবচেয়ে বেশি। সংখ্যালঘুকে আশ্রয়-প্রশ্রয়, বল-ভরসা দেয়ার দায়িত্ব কেবল সংখ্যাগুরু সম্ভ্রম প্রতিকেতীর নয়, পূর্ণনাগরিক অধিকারের নিশ্চিতি দেয়ার দায়বদ্ধতা সরকারের তথা রাষ্ট্রের।

আইন প্রয়োগে হেরফের : অর্পিত সম্পত্তি

শোনা যাচ্ছে সরকার দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে পূর্বকার 'শত্রু সম্পত্তি' এখনকার নামের 'অর্পিত সম্পত্তি' বিক্রয় করে অর্থভাণ্ডার চাঙ্গা বা পূর্ণ করতে মনস্থ করেছে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার সন্তানদের। সন্তানের অভাবে ভাই, ভাইপো, ভাগনে, জ্ঞাতিরা পেয়ে থাকে। সব শাস্ত্রে এবং সব জাতি-উপজাতির আদিবাসীর অরণ্যবাসীর মধ্যে এ বিষয়ে সর্বজন স্বীকৃত, গ্রাহ্য ও মান্য নীতি-নিয়ম রয়েছে। এককালে ভূ-সম্পদই ছিল শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পদ। ভূমি রাজস্বই ছিল রাজার, সামন্তের, জমিদারের, জায়গীরদারের আয়ের মুখ্য উৎস। বিজ্ঞানের, সংস্কৃতি সভ্যতার তথা মনন-মনীষার প্রসূত নানা বিচিত্র বিকল্প ব্যবস্থায় মানুষের সম্পদ প্রতীক আর্থিক জীবনও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। এখন ব্যাঙ্কে জমা-রাখা কাগজে অর্থের প্রতীক চেক বই-ই সম্পদ। ওই চেক বই সঙ্গে থাকলে পৃথিবী পরিক্রমা করা যায় হনির্ভর হয়ে নিশ্চিন্তে।

আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মুসলমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, ব্রিটেনে অস্ট্রেলিয়ায় নাগরিকত্ব নিয়েও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারায় না, হারায় না পৈত্রিক বা নিজের স্বদেশস্থ অর্থ-সম্পদের অধিকার ও উত্তরাধিকার। কিন্তু সংখ্যালঘুরা ভারতে আশ্রিত বা অভিবাসিত হলে পাকিস্তান আমলে শত্রু বলে

পরিগণিত হত, বাংলাদেশ রাষ্ট্রে 'শত্রু'র ব্যবহার পরিহার করা হয়েছে, কিন্তু কূটকৌশলে 'শত্রু সম্পত্তি' এখন 'অর্পিত সম্পত্তি' রূপে সরকারের আয়ত্তে ও তত্ত্বাবধানে রয়ে গেছে।

'বাঙালীসত্তা' অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধে ভারতেরও সমর্থন, সহায়তা, সাহায্য পেয়ে আমরা 'বাঙলাদেশ' নামের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে তুণ্ড, তুট, হুট ও ধনা হয়েছি। আমাদের প্রথম সংবিধানে নাগরিক মাত্রই 'চার নীতির' সীলতে সমঅধিকার লাভ করেছিল। জাতি, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস নির্বিশেষে অভভেদে বাঙালী বা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীন ও সমান নাগরিক ছিল। কাজেই সে সময়েই ভারতে যে অভিবাসিত হয়েছে, তার বাঙালানেশী নাগরিকত্ব বিনুগ্ন হওয়ার কথা নয়, কেন না, যুক্তরাষ্ট্রের, যুক্তরাজ্যের, কানাডার নাগরিক বিনুগ্ন হওয়ার কথা নয়, কেন না, যুক্তরাষ্ট্রের, যুক্তরাজ্যের, কানাডার নাগরিক মুসলিম বাঙালীর বা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের লোকের নাগরিকত্ব অটুট থাকছে। তাহলে হিন্দুরই বা নাগরিকত্ব যাবে কেন? তাছাড়া কথায় বলে নড়া ও মরা সমান, যে দেশত্যাগ করে ভারতে গেল, তাকে 'মরা' বা মৃত বলে ধরে নিয়ে তার পৈত্রিক বা নিজের পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হিন্দুর শাস্ত্রিক উত্তরাধিকার আইন অনুসারে ভাই, ভাইপো, ভাগনে, জ্ঞাতিরাই তো হওয়ার কথা। অধিকারী বা হকদারকে বঞ্চিত করে সরকার শত্রু সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি প্রকৃতি নানা অযৌক্তিক ও অবৈধকৌশল অজুহাতে তা বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের অপচেষ্টা করছে বলেই আমাদের ধারণা, রাষ্ট্রের এক জেনির বা শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ের লোককে এভাবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পর করে রাখা, ক্ষুণ্ণ, জুখ, অসন্তুষ্ট করে রাখা জাতীয়তাবোধ বা অকৃত্রিম রাষ্ট্রিক অনুগত্য গড়ে ওঠার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাতে রাষ্ট্রের দুর্বলতা ঘোচে না। সে-দুর্বলতা আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামষ্টিক শক্তির ও জাতীয় সংহতি চেতনার দুর্বলতা।

সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রের বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 'দায়' কি 'সম্পদ' সে-বিতর্কে যাব না। কিন্তু আড়ই কোটি মানুষকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারব না, বিতর্কিত করতে পারব না, হননে বিলোপ করতে পারব না, পীড়নে-শোষণে দমনে-দলনেও ধ্বংস করতে পারব না। কাজেই যাকে ছেলে বলা যাবে না, যাকে স্বইয়ে পরিণে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, যার প্রতি কোনও রাষ্ট্রিক-প্রশাসনিক দায়িত্ব-কর্তব্য এড়াতে পারব না, যার নিঃবতার, নিরন্নতার প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হবে না, তাকে

বিফুল রুটি শত্রু করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের তথা সরকারের নীতি হওয়া উচিত তাদের আপন করে নেয়া, আত্মীয়সম সমাদরে বশ ও বন্ধু করে নেয়া, যাতে সে তার স্বদেশে স্বভিট্টে স্বঘরে মৌরসী অধিকারে নিরুপহ্রবে, নিরাপদে, নির্বিঘ্নে, নির্বিবাদে, নির্বিঘ্নে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নাগরিকের মতো নিশ্চিন্তে তার জীবন-জীবিকার সাধ্যমত ব্যবস্থা করতে পারে। এ মাটি, এ মানুষ, এ রাষ্ট্র যে তারই, তা যেন সে অনুভব-উপলব্ধি করে গৌরব-গর্ববোধ করে। দেশের মানুষের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করতে অন্তরোথিত আবেগ-সংকল্পে এগিয়ে আসতে পারে।

‘অর্পিত সম্পত্তি’ সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে আশা করি এ তথ্যটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য হবে যে, কারো কারো দালান, মাটির খর, উঠান, পুকুর, ঘাট, বাড়ির প্রবেশদ্বার প্রভৃতি এজমালি সম্পত্তি অর্থাৎ পরিবারের সবারই সাধারণ ব্যবহারের অধিকারভুক্ত। তেমন স্বত্ব বেচা-কেনা করার পরিণাম হচ্ছে দুই কোটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বিপর্যয়জাত দুঃসহ যন্ত্রণা সৃষ্টি করা। আমরা তাই হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগে আত্মীয়দেরই পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ-দখল করতে দেয়ার জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করছি। এ সুপারিশ নিশ্চয়ই বেআইনিও নয়, অসঙ্গত-অযৌক্তিক আবদারও নয়।

সেকুলার সংবিধানই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক

মানুষ ও প্রাণী। সচেতন অনুশীলনে সংঘম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, ব্রীতি, ত্যাগ, পরার্থপরতা, ক্ষমা, ন্যায্যতা প্রভৃতির গুরুত্ব, আবশ্যিকতা, প্রয়োজনীয়তা, অনুভব-উপলব্ধি না করলে কেউ কখনো মানবিক গুণে তথা মনুষ্যত্বে বা মানবতায় প্রাণীসুলভ বৃত্তি-প্রবৃত্তির উর্ধ্বে উঠতে পারে না। মনুষ্যত্বের সচেতন অনুশীলন করে খুব কম লোকই। ফলে আমাদের চারিদিককার লোক চলিত হয় লাভে, লোভে ও স্বার্থে। অবশ্য প্রেম-ব্রীতি-স্নেহ-মমতায়ও মানুষ আবেগপ্রবণ হয় এবং আবেগতড়িত মানুষ ত্যাগ স্বীকারে সম্মত থাকে। কাম-প্রেম-লাভ-লোভ-স্বার্থবশে মানুষ জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা ভেদ করে না, মানে না। এসব মানসিক দোষ-গুণ ব্যক্তি বিশেষের—গৌত্রিক সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিক নয়।

এ কারণেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, নৈতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ যেসব দেশে বাহ্যত উন্নত বলেই আমরা জানি ও মানি, সেসব দেশেও প্রাণী-প্রবৃত্তি চলিত মানব প্রজাতির মানুষের সংখ্যা বাস্তবে অনেক বেশি। রাষ্ট্র বিপ্লবে, গৃহযুদ্ধে, দাঙ্গায়, যুদ্ধে, বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী-বিশ্রোণি বিদ্রোহে তা বীভৎসভাবে পরিব্যক্ত হয়। তখনই জানা, দেখা ও বোকা যায় যে মানুষের মতো হিংস্র প্রাণী জগতে নেই। এরা বিদ্বেষ, প্রতিশোধবাহু, জিঘাংসা চিত্তের গভীরে প্রজন্মক্রমে পুঁতে রাখে, ভোলে না কখনো।

কাজেই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস লাভ-লোভ-স্বার্থ প্রভৃতি মানুষে মানুষে বিরোধ-বিবাদ-ঘেঁষ-ঘন্স-সংঘর্ষ-সংঘাত স্পৃহা জিইয়ে রাখবে লঘু-গুরুভাবে।

যেহেতু সব মানুষ যখন সংঘমে, পরমত ও আচরণ সহিষ্ণুতায়, সততায়, ন্যায় চেতনায় সূজন ও সজ্জন হবে না কখনো এবং যেহেতু ‘একে নষ্ট করে সবে দুঃখ পায়’, আর যেহেতু ‘গড়ন ভাঙিতে আছে কত খল/ভাঙন গড়িতে পারে সে বড় বিরল’ সেহেতু মানুষের মধ্যে লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনার অদম্যতা রোধ করতে, মানুষের মনের সর্বপ্রকার ‘কালি’ মোচাতে তথা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-শ্রোণি বিদ্বেষ, স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সুপ্ত, লুপ্ত, নিক্তির রাখতে নির্মোহ নিরপেক্ষ সেকুলার সরকার বা রাষ্ট্রদর্শ আবশ্যিক ও জরুরি—যেমনটা ছিল বা আছে কম্যুনিষ্ট শাসিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থায়। নইলে গৌত্রিক, শাস্ত্রিক, ভাস্কর্য ও আঞ্চলিক স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্বেষ চেতনা জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রভাবিত হয়ে প্রশমিত হবে না। মনুষ্যাবয়বে মানুষ প্রাণী বলেই গোটা পৃথিবীতে চিরকালই গৌত্রিক, গোষ্ঠীক, মতবাদী সাম্প্রদায়িক, বার্ষিক, ভাস্কর্য, আঞ্চলিক অধিজনেরা উনজনদের শাসনে-শোষণে-পীড়নে-হত্যায়-স্বাভাবিক মানস স্বাস্থ্যে তাদের কখনো আত্মবিকাশের, আত্মোন্নয়নের, আত্মোৎকর্ষের সুযোগ-সুবিধে দেয়নি। আজও দেয় না, জাতিসঙ্ঘের সনদে-শ্রোগানে তত্ত্বাবধানে-অভিভাবকত্বেও কোনও কাজ হয় না, হয়নি। উত্তর আয়ারল্যান্ড কিংবা ফকল্যান্ড যেমন, তিব্বত, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, কাস্মীর, পাঞ্জাব যেমন, কুইবেক যেমন, কারেন যেমন, তেমনি আরো অসংখ্য উনজন বা দুর্বল জাতি, উপজাতি, আদিবাসী কিংবা ভিন্ন রঙের, রূপের, ধর্মের,

ভাষার, শাস্ত্রের, আচারের মানুষ অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে নিরাপদে নিরুপদ্রবে নিশ্চিত নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করতে পারছে না এ মুহূর্তেও।

আমাদের দেশেও রয়েছে সংখ্যালঘুর নানা বঞ্চনার অভিমান-অনুযোগ-অভিযোগ, নানা মানসিক ও বৈষয়িক নির্যাতনের অভিযোগ, অনিশ্চয়তার ও উপদ্রবের আশঙ্কার অস্তিত্বের কারণ। এগুলোর উপশম-বিলোপ-প্রতিরোধ কেবল সরকারের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ সামাজিক মানুষের কেউ কেউ হৃদয়বান হিসেবে গা-পা বাঁচিয়ে সহানুভূতিশীল হতে পারে মাত্র, কিন্তু সক্রিয় সাহায্যে এগিয়ে আসা সম্ভব হয় না। সম্ভবতঃ প্রয়াসও সব সময়ে কেলেই হয় না।

তাই বলাই সরকার যদি সেকুলার হয়, অর্থাৎ সংবিধান যদি শাসন-প্রশাসনের ক্ষেত্রে কোনও শাস্ত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলে, জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-অঞ্চল-নিবাস-যোগ্যতা-নির্বিশেষে মানুষকে কেবল নাগরিক হিসেবেই দেখে নীতি-নিয়ম ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তা হলেই কেবল সাম্প্রদায়িকতা সুপ্ত, গুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকবে। সংখ্যালঘুও নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে নির্বিরোধে নিরাপদে নিশ্চিন্তে স্বদেশে, স্বভিটেতে স্বনির্ভর হয়ে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে, তার মানসিক স্বাস্থ্যও থাকবে অটুট। তেমন অবস্থায় সংখ্যালঘুদেরও দেশপ্রেম থাকবে সংশয়াতীত।

সরকার যদি অসাম্প্রদায়িক নির্মোহ দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু সমস্যা-সঙ্কট বুঝতে ও দেখতে চাইত, তাহলে 'প্লানি' কিংবা 'বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য' গ্রন্থ দুটোতে মুদ্রিত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কিছু অপরাধের তদন্ত এবং অপরাধীকে বিচারের ব্যবস্থা করে সংখ্যালঘুর বল-ভরসা বৃদ্ধি করতে পারত। হতে পারত সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার আত্মভোজন। সে চেষ্টা সরকার করেনি, করে না। কাজেই সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে, কমছে না।

□

ওরা এবং আমরা

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

আমাদের বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা মূলত উপর থেকে নিচ পর্যন্ত লম্বালম্বি-সোজা দুটো ভাগে বিভক্ত। যার একভাগে রয়েছে বামুন কায়েত বন্দি—এককথায় উচ্চবর্ণ। আর এক ভাগে রয়েছে কাওরা বাগদি নানো পোদ জেলে মালো—যা এককথায় নিম্নবর্ণ।

এই সমাজটার মাঝামাঝি আড়াআড়ি আর একটা বিভাজন রয়েছে। উচ্চবর্ণের যারা উচ্চ আর নিম্নবর্ণের যারা উচ্চ অর্থাৎ শিক্ষা দীক্ষা আর্থিক সম্মতিতে এগিয়ে থাকা লোকজন এদের একটা শোভন সুন্দর নাম ভ্রলোক। ভ্রলোকের পরিচয় চিহ্ন : — ভালো খায় ভালো পড়ে ভালো বাড়িতে থাকে ভালো গাড়িতে চড়ে কারণে অকারণে ফটাফট ইংরেজি বলে।

এই ভ্রলোক শ্রেণির মধ্যে অবশ্য বামুন কায়েত বন্দিদের সংখ্যাই বেশি। শতকরা নব্বই। কারণ রাজ ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা শিক্ষায় দীক্ষায় এগিয়ে যাবার সুযোগ আগে তাদের নাগালে এসেছে। সেই সুযোগকে যথাযথ ব্যবহার করে আর্থিক দিক থেকে বলিষ্ঠ হতে পেরেছে। নিম্নবর্ণের—সবার তো নয়, তবে বিনামূল্যে হলেও এখন সে সুযোগ কিছু মানুষের করতলগত হয়েছে তারা তার সুনিপুন ব্যবহার দ্বারা চড় চড় করে উচ্ছে উঠে গেছেন। এখন তো এদের অনেকের এত বিস্তৃত বৈভব—যার উপর দাঁড়িয়ে এরা চাঁদ তারা ছুঁতে সক্ষম।

এদেশে এখন ধনবাদী-বৈষ্য ব্যবস্থা প্রবলমান। যে কেউ যে কোনওভাবে যতখুশি ধন উপার্জন করতে পারে। শুধু শাসক দল-আয়কর আর সিবিআইকে ম্যানেজ করে রাখতে পারলেই কোনও সমস্যা নেই। সে কলায় কিছু নিম্নবর্ণের উচ্চলোক দক্ষ হয়ে উঠেছে।

“শিক্ষা আনে চেতনা”। অশিক্ষিত লোক চোখ থাকতেও অন্ধ। এরা শিক্ষিত হয়ে—চক্ষুজ্ঞান হয়ে সচেতন হয়ে কোনও পথ পদ্ধতিতে উচ্ছে আরও উচ্ছে ওঠা যাবে—সেটা ঠিকঠাক বুঝে গেছে।

এদেশে একজন বড় আশাবাদী ব্যক্তি ছিলেন—যার নাম বাবা সাহেব ভীমরাও

রামজি আহমেদকর। বিনি নিজে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে স্বজাতির মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন—তাদের আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে—সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে তোকর পথ সুগম করতে। তিনি বড় আশা করেছিলেন—এইসব লোক যে সমাজ থেকে আসছে - পদ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবার পরে—সেই পিছিয়ে থাকা মানব গোষ্ঠীর জন্য দয়া-নরদ মানবিকতা সহযোগিতার দরজাটা খুলে দেবে। সে আশা তার বার্থ হয়ে গেছে। এরা এখন অমানবিকতা নিষ্ঠুরতাতে হয়ে উঠেছে উচ্চবর্ণের বাপ। হয়ে উঠেছে আব্বাসুখ সর্বদ্ব—উচ্চাশাভূত এক একটা যন্ত্র মানব। এদের একমাত্র চিন্তা নিজে এবং নিজের পরিবার নিয়ে। যাদের আমরা ভদ্রলোক বলছি, জনসংখ্যার নিরিখে সেখানে প্রায় শতকরা নব্বই জন বামুন কায়েত বন্দির অবস্থান। দশজন পোদ নমো কাওরা বাগদি বা অন্য নিম্নবর্ণ।

এটা নিয়েই শিক্ষিত নিম্নবর্ণদের তুলন অসন্তোষ। বাক বিতণ্ডা মিটিং মিছিল সভা সেমিনার পত্রিকার লেখালেখি। ভদ্রলোক হয়ে ওঠার যে প্রাথমিক শর্ত-বিস্তারন হওয়া। খালি গা খালি পা খালি পেট বস্তিতে বাস করা কোনও লোককে কেউ ভদ্রলোক বলে না। বলে যার বাড়ি গাড়ি “ব্লি” চাকর আছে। আর এইসব প্রাপ্ত করার সহজ সুলভ পথ—যেনতেন প্রকারে একটি বড় চাকরি বাগিয়ে নেওয়া। তাহলেই ডান বাম দু’হাতে কামাই।

এটা ঠিক যে যাদের জনসংখ্যা শতকরা মাত্র পনেরো চাকরি ব্যবসা রাজনীতি জমি জিরেত নব্বই ভাগ তাদের কল্জায়। বাকি দশ ভাগ রয়েছে সেই জনগোষ্ঠীর হাতে যাদের জনসংখ্যা পঁচাশি শতাংশ। অবশ্যই এটা একটা বৈষম্য। তবে সেই পঁচাশি শতাংশের মধ্যে শিক্ষিত চাকরি ব্যবসা রাজনীতি শিল্প সাহিত্য এসব ক্ষেত্রে যোগ্যতর কত জন। মাত্র দুই বা তিন শতাংশ। যদি আটোসাটো দরজাটা একটু খোলে যদি উপর থেকে কিছু প্রাপ্তি চুইয়ে নামে—সে তো কুক্ষিগত হয়ে যাবে ওই দুই বা তিন শতাংশ শিক্ষিত লোকের হাতে। যাদের বাপ ঠাকুরদা ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার কোল নিজের কোলে টেনে সচ্ছল বিস্তারন হয়ে গেছে। যে কারণে তাকে শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছে। এতে শিক্ষা দীক্ষা বঞ্চিত কোটি কোটি নিরন্ন নিম্নবর্ণের কোনও হিত হবে? আজ যার মা বামুন বাড়ি বাসন মাজে যার ছেলে রিকশায় নিত্য বোঝা বয়, যার মেয়ে কায়েতের কাপড় কাঁচে, কাল

কোনও নমো কাওরা বাগদিবাবুর ওই কাজগুলো করবে। আজ সে দুঃখে কষ্টে আছে কালও তাই থাকবে।

একথা মিথ্যা নয় যে—যে কোনও সরকারি দপ্তরে একশো পদের নব্বই বা তার চেয়েও বেশি দখল করে বসে আছে উচ্চবর্ণের লোকেরা। বহু সংরক্ষিত পদে যোগ্য লোক না পাওয়ার অজুহাতে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সে যদি হয় তাহলে কিছু শিক্ষিত নিম্নবর্ণ করে কন্ম খাবার সুযোগ পায়। নিম্নবর্ণের ‘সচেতন’, চিন্তাবিদ এই নিয়ে গলা ফাটাচ্ছে—কেটা পূরণ করো, পূরণ করো কোটা। কারণ তার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি ভাইপো ভাইঝি ভাগনে ভাগনি সব পাশ দিয়ে শিক্ষিতের সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে।

চাকরি পাবার প্রথম শর্ত একটা সার্টিফিকেট। যেটা পাবার জন্য পরীক্ষায় বসা এবং একশোর মধ্যে তেত্রিশ নম্বর তোলা জরুরি। যে নাথার তোলার জন্য যদি বই পড়ে মনে রাখতে পারো অতি উত্তম। না পারলে চোতা মারতে পারো টুকলি করতে পারো। তবে সাবধান কেউ যেন দেখে না ফেলে। অথবা কোনও আরাবুলের স্মরণাপন্ন হও। তার নির্দেশে কোনও শিক্ষক তোমাকে সাহায্য করবে উত্তর লিখতে।

আমি এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মী। আমাদের পাশেই একটা বি.এড. কলেজ আছে। এই পরীক্ষায় পাশ হলে সে হবে শিক্ষক। শিক্ষক অর্থাৎ মানুষ গড়ার কারিগর। বড় মহান কর্ম। কলেজের পিছন দিকে গোটা কয়েক জানালা—যেদিকে কেউ যায় না, যখন পরীক্ষা হয় তারপরে কাড়দার যায়, বস্তা খানেক চোঁতা পরিষ্কার করতে। এই হচ্ছে পরীক্ষা-শিক্ষক আর শিক্ষা ব্যবস্থা। আর কিছু নয় শুধু পায় সার্টিফিকেট। এইসব শিক্ষক পরে ছাত্রকে শিক্ষা দেবে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা এর প্রবর্তক সাগর পাড়ের শাসকেরা। যারা এদেশ দখল তো করেছিল কিন্তু তত জনবল ছিল না যে গোটা দেশটায় শাসন করে। তাদের দরকার পড়েছিল কাজ চালিয়ে নেবার মত একদল আজীবন দাসের। তাই তারা প্রচলন করেছিল এই শিক্ষা যেখানে আব্বাসমানহীন একদল চাকর তৈরি হবে। চাকরি নামক গোলামগিরিতে যুক্ত হয়ে ঘৃণা করতে শিখবে দেশের স্বাধীন পেশার সাধারণ মানুষকে। এই চাকরিতে শিক্ষিত চাই না বিদ্বান চাই না জ্ঞানী চাই না চাই চালাক চতুর ধূর্ত কৌশলী। পরীক্ষায় পাশ করেছে, সে যে ভাবেই হোক, এতেই

উচ্চবর্ণের যে সব উচ্চগুণ আছে আত্মসাৎ না করতে পারুক অপগুণগুলো অবশ্যই আত্মসাৎ করে নেবে। আর যদি কোনওদিন কোনও কারণে ছোটলোক-ভদ্রলোকের সম্মুখ সমর হয়—দাঁড়াবে ভদ্রের লোকদের পক্ষেই।

প্রভাব প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থ পদ এসব নিয়ে ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তো সভ্যতার সূচনাকাল থেকে চলমান। মহাভারতের মহাযুদ্ধ সে তো এই কারণেই। একালের দুই কুলীন বামুন বৃদ্ধদের ভট্টাচার্য মমতা ব্যানার্জি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এক জাত বলে তো কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ছে না। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর মঞ্জুল ঠাকুর এক মায়ের পেটের দুই ভাইয়ের ক্ষমতা ধরে রাখার সেই গজ কচ্ছপের যুদ্ধ কে না জানে!

ফলে সেই উচ্চবর্ণ ভদ্রলোকদের মধ্যে অনুপ্রবেশ পেয়ে যাওয়া নিম্নবর্ণ ভদ্রলোকেরও কারণ না কারণও সাথে বিবাদ বিসংবাদ হতে পারে। তার চেয়ে অধিক ক্ষমতাস্বার্থ কারণ আক্রমণের শিকার হতে পারে। এর পিছনে জাতিগত ঘৃণা বা শত্রুতার ব্যাপারটা অতি গৌণ ব্যাপার। মুখ্য কারণ খুঁজলে দেখা যাবে অন্যকিছু। হয়তো পাতে কোল টানাটানির খেলা।

এক ব্যক্তির সাথে আর এক ব্যক্তির, এক বর্ণের সাথে আর এক বর্ণের, এক ধর্মের সাথে আর এক ধর্মের এক জাতির সাথে আর এক জাতির এক দেশের সাথে আর এক দেশের বিবাদ বিরোধ বৈরিতায় প্রচলিত বহু কাহিনির মধ্যে সত্য থাকে খুব কম। তাকে সেই সন্ধান করতে পারে যে—আগাম অনুমান, পূর্বাগ্রহ, প্রচারিত সংবাদ দ্বারা প্রভাবিত নয়।

মোহনদাস করম চাঁদ গাফীর সাথে ভীমরাও রামজি আশ্বেদকরের বিরোধের একটা অর্থ তো বোঝা যায়—দু'জন দুই বর্ণের প্রতিনিধি। বিরোধ অতি স্বাভাবিক। কিন্তু জগৎজীবন রাম তাঁর বিরোধী কেন ছিল? দু'জনই তো দলিত নেতা! পি. আর. ঠাকুর আর যোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের মধ্যে সম্ভাব কেন ছিল না? দু'জনই নমোদের মঙ্গলকামী।

এখানে মজাটা হচ্ছে এই যে—যদি কোনও নিম্নবর্ণ বুদ্ধিমানের প্রতিপক্ষ উচ্চবর্ণের কেউ হয়, যদি তার কাছে নিম্নবর্ণ বুদ্ধিমান পরাভূত হয়, বিপাকে পড়ে সাথে সাথে সে আঁকড়ে ধরবে সেই রক্ষা কবচ—“আমি নিম্নবর্ণ বলে ব্রাহ্মন্যাবাদীরা চক্রান্ত করেছে।” এতে যদি পালে কিছু সহানুভূতির বাতাস লাগে।

ঘটনাটা আমার শোনা। এক নিম্নবর্ণের উচ্চপদস্থ অফিসার ঘুম খেতে গিয়ে থাতেনাতে ধরা পড়েছে। তখন তার সাফাই ছিল—“ওরা লক্ষ লক্ষ খেয়ে নিচ্ছে। সবাই সব জানে কিন্তু কেউ কিছু বলে না। উঁচু জাত যে। আমি মাত্র দশ হাজার নিয়েছি ওমনি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিচু জাতির লোককে কিছুতে ওরা উঁচুতে উঠতে দেবে না।” সহানুভূতি কুড়াবার কী কদাকার প্রয়াস।

আমরা সবাই জানি—লালুপ্রসাদ যাদব, মধু কোড়া, শিবু সোরেন, মায়াবতী এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত নিম্নবর্ণের এই সব নেতারা কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে, অসংভাবে আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত। হতে পারে কোনও একদিন কোনও এক রাজনৈতিক কারণে এরা অভিযোগ থেকে প্রমত্তভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। কারণ এই দেশের বিচার ব্যবস্থায় দোষীকে নির্দোষ আর নিরাপরাধীকে অপরাধী বানাবার বহু কায়দাকানুন মজুদ আছে। মোটা মোটা আইনের আইনের বই যেটে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানাবার জন্য বসে আছে বড় বড় আইন বিশারদ। যে তাকে টাকার খলি দেবে তারই পক্ষে লড়বে।

এখানে আমার একটি অবোধ জিজ্ঞাসা—একই আইনের কেতাব পড়ে একই পরীক্ষায় পাশ করে দুই কোর্টে চাকরি পাওয়া দুই বিচারক একই কেসে দু'রকম রায় কি করে দেয়? একজন যাকে দেখে কুটকুটে কালো আর একজন তাকে দেখে দুধে ধোওয়া ধবধবে সাদা। কোন মস্ত্রে এমন অসাধ্য সাধন হয়?

উদাহরণ হিসেবে বিহারের সেই বাথানীটোলা নর সংহারের ঘটনাটা সামনে আনা যেতে পারে। বাথানীটোলা একটি দরিদ্র গ্রাম যেখানে শ'খানেক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের পরিবারের বাস। জাতিগতভাবে যারা দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। আশেপাশের জোতদার জমিদার জাতিগতভাবে যারা উচ্চবর্ণ—এই সব মানুষকে বাধ্য করতে নামমাত্র মজুরিতে তাদের জমিতে কাজ করতে। একদিন দাবি করল তারা যথোপযুক্ত মজুরি না পেলে তারা আর জোতদার জমিদারদের জমিতে ঘাম ঝড়াবে না। এই অপরাধ—ব্যাস মাত্র এই অপরাধে উচ্চবর্ণ ভূস্বামীদের বন্দুকবাজরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দরিদ্র-ক্ষেত মজুর মানুষগুলোর উপর। গুলিতে ঝাঁকরা করে দিল একশো চার জন মানুষকে। সেই কেসে ছিয়াজিশ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। নব্বই দিন পরে আসামীরা জামিন পেয়ে যায় তবে বিচার চলতে থাকে। সেশন কোর্ট সাফ্য প্রমাণ পেয়ে বোলজনকে ফাঁসি আর চল্লিশ জনকে

যাবজীবন সাজা দেয়। আসামীরা হাইকোর্টে আপিল করে সেখানেও সাজা অপরিবর্তিত থাকে। ফের তারা সুপ্রীম কোর্টে যায়। খুবই সম্ভব কারণে দলিত দরিদ্র শ্রমজীবী সেই সব মানুষ, যারা ঘটি বাটি বিক্রি করে হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে পেরেছিল—লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা চলা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত আর যেতে পারে না।

বাবা সাহেব সে সব মানুষগুলোর জীবনস্তর উন্নত করার জন্য আত্মত্যা সংগ্রাম করেছিলেন, তার সংগ্রামের সবটুকু সুফল চেটেপুটে খাওয়া—লোকজনকে তিনি বলেছিলেন :— পে ব্যাক টু সোসাইটি। কিন্তু তারা এমনকি যারা রাতদিন বাবা সাহেবের নামের মালা জপে—নিতে নিতে নিতে নিতে—দেবার ব্যাপারটা ভুলে গেছে। ফলে কেউ কোনও সাহায্য নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। এদিকে এই বিচার প্রক্রিয়া চলেছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর। সব শেষে রায় দিল সুপ্রীম কোর্ট—সব আসামী বেকসুর খালাস। রক্ষা পেয়ে গেল তারা জেলেবাস-ফাঁসি থেকে। এখানে স্বাভাবিক ভাবে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে আসে—এরা যদি নিরপরাধ তাহলে সেই একশো চারজনকে গুলি করে মরল কারা? সেই অপরাধীকে পুলিশ কেন ধরেনি? বন্দুকগুলো বা গেল কোথায়? আর যে সব প্রমাণের উপর নির্ভর করে লিখল এবং উচ্চ দুই আদালত সাজা ঘোষণা করেছিল তারা কি গাঁজা খেয়ে বিচার করেছিল? তারা গাঁজা খেয়েছিল নাকি শেষ বিচারক ঘুষ খেয়ে এই রায় দিল?

তবে সব কথার শেষ কথা এটাই যে ন্যায় নয় বর্তমান যে বিচার ব্যবস্থা—এখানে জয় হবে বিজয়ের-বিস্তারনের। বাথানীটোলার ব্যাপারটা দলিত আর উচ্চবর্ণে ঘটেছে—উন্টে হলেও একই ব্যাপার ঘটবে। আর আমি যেটা জোরের সাথে বলতে চাইছি—যে যত বড় অপরাধী হোক বিচার ব্যবস্থার ফাঁক ফাঁকর গলে ছাড়া পেয়ে যাবার পথ পেয়ে যেতে পারে। যদি তার অর্থ থাকে।

এই পর্বেই সাহারা, সারদা, সুধরাম, এ রাজা, কনিমোখির মত লালুয়াদব মায়াবতী শিবু সোরেন মধু কোড়া—সব ছাড়া পেয়ে যাবে সব অভিযোগ থেকে। কিন্তু আইনের হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারলেও এটা প্রমাণ হবে না যে এরা সব গঙ্গাজলে ধোয়া পুত পবিত্র তুলসী পাতা। আর যদি অপরাধী প্রমাণিত হয়ে যায়—গান তো আছেই। “বিরোধীরা চক্রান্ত করে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে”। নিম্নবর্ণের নেতা হলে এক ধাপ এগিয়ে বলবে—উঁচু জাতের যড়যন্ত্র।

লেখার শুরুতে লিখেছিলাম যে—লম্বালম্বি সমাজে দুটো ভাগ একটা উচ্চবর্ণ আর একটা নিম্নবর্ণ। নিম্নবর্ণ সমাজের যেমন কিছু লোক নানা সুযোগ সুবিধা পেয়ে উঠে উঠে গেছে তেমনই নানান বিঘ্ন বিপর্যয়ে উচ্চবর্ণের কিছু লোক নিচে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। ফলে লম্বালম্বির পরে আর একটা বিভাজন ঘটেছে আড়াআড়ি। উপরের অংশের যেমন সম্মিলিত নাম ভদ্রলোক নিচের অংশের নাম ছোটলোক। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ বিভেদের চাইতে ছোটলোক ভদ্রলোক বিভেদটা বড় প্রবল। তবে কী বর্ণবাদ এখানে নেই? আছে, সেটা ঢাকা পড়ে রয়েছে ধনবাদের আড়ালে। এই কারণে এখানকার বহু বুদ্ধিজীবী দাবি করেন বাংলার বর্ণবাদ নেই। সেটা যে আছে তা জানেন যে দরিদ্র সেই নিম্নবর্ণ তাকে দরিদ্রতার সাথে বর্ণবাদের দ্বিমুখী অসহ্য অবস্থার মার সইতে হয়।

উচ্চবর্ণের উচ্চলোক আর নিম্নবর্ণের উচ্চ লোক নিয়ে যে ভদ্রলোকের সমাজ—এরা সবই জোঁকের মত, ছোটলোকদের শ্রম ঘাম শুয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাই সমাজটাকে এভাবেও বিভক্ত করা যায়—শোষক আর শোষিত, শাসক আর শাসিত। এই শাসক শোষক-ভদ্রলোক শ্রেণির কেউ কেউ যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক আমলা পেশা পছন্দ করেন কেউ কেউ বেছে নেন উচ্চ ওঠার শর্টকাট পথ—রাজনীতি। বিনা পুঁজির সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা।

আগে সারা পৃথিবীতে নিয়ম ছিল রাজার ছেলে রাজা হবে। ফরাসি বিপ্লব সেই নিয়মকে চুরমার করে দেয়। সেই প্রথম মানুষ দেখে রাজার ছেলে না হয়েও রাজ ক্ষমতা দখল করা যায়, রাজসুখ প্রাপ্ত করা যায়। যদি পাশে পিছনে জনগণকে জমা করা যায়।

আমাদের দেশেও একদল উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের মধ্যে রাজসুখ পাবার চেষ্টা শুরু হল। দেশে তখন ইংরেজ শাসন। এদের না তাড়াতে পারলে সে চেষ্টা আশা ইচ্ছা তো সফল হবার নয়। কী করা যায়। অনেক ভেবে চিন্তে পাশে পিছনে জনগণকে জমা করার ধান্ডায় উদ্ভাবন করল এক শ্রোগান-স্বাধীনতা চাই। বিদেশি ইংরেজদের হাতে শাসন তাই দেশের দুরবস্থা। এ থেকে নিস্তার পেতে, ভারতীয় হাতে ভারতের শাসন চাই।

দেশ স্বাধীন হল, ভারতীয়দের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা এল, কিছু লোকের রাজসিক আরাম আয়েশ এসে গেল। দেশ আর দেশের লক্ষ কোটি

সাধারণ মানুষের কি হল। কী পেল তারা? কিছু বুড়োলোক যে বলে এর চেয়ে ইংরেজ শাসন ভালো ছিল। তাহলে?

একজন লোক—সেও বুদ্ধিমান। সে দেখল ইংরেজ চলে গেলে তার পায়ে কিছু পড়বে না, সব মধু মেয়ে দেবে অন্যলোক। তাই সে একদল লোককে খেপিয়ে তুলল—যে স্বাধীনতা আসছে সেটা হিন্দুদের স্বাধীনতা। এতে মুসলমানদের কোনও লাভ হবে না। মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ চাই।

দেশ ভাগ হল, মুসলমানদের হাতে খণ্ডিত টুকরোর শাসনভার গেল। হল কী মুসলমানদের জীবন স্তর উন্নত?

কিছুকাল পরে আবার একজনের মনে রাজসুখ পাবার বাসনা জাগল। একদল ভারতীয়দের হাতে শাসন চাই, একদল মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা চাই, বলে রাজক্ষমতা হাতিয়ে নিয়ে সুখে আছে। এখন সে নতুন কথা কী বলে জনগণকে চেতায়? সে জাগিয়ে তুলল বাঙালি আবেগ। ওইসব উর্দু ওলাদের হাতে শাসন ক্ষমতা বলে বাঙালির কোনও উন্নতি হচ্ছে না। বাঙালির হাতে ক্ষমতা চাই। তৈরি হল নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। বাঙালির উন্নতি হল কোথায়? পৃথিবীর দরিদ্র দেশের মধ্যে আজও তার নাম। এটা কেন?

এভাবে যে হয় না, হবে না সেটা জানা কথা। হবে শুধু কিছু অল্প সংখ্যক নেতার ইচ্ছাপূরণ।

এর এক ধাপ নিচের একদল নেতা যারা অতবড় ঝুঁকি না নিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকেই—সংবিধান প্রদত্ত অধিকার বলে ছোট ছোট রাজ্য হবার স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত।

এর নিচের ধাপে আছে আর একদল নেতা যারা তৈরি হয়ে থাকা প্রদেশের রাজ্য উজির হবার জন্য নানা খেলা খেলছে। কেউ তামিল ভাবাবেগ মারাঠি ভাবাবেগ উকে তুলে ধাওয়া করেছে উদ্দেশ্য পূর্তির লক্ষ্যে।

একদল দেশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালান্ত করা ধনীরা যাদের মাটিতে না পা দেওয়া, সেহে রোদ না লাগানো—দুলাল প্রথর বুদ্ধি বিবেচনায় বুঝে গিয়েছিল দেশটা বড় গরিব, শ্রমিক কৃষক খুবই অসহনীয় অবস্থায় জীবনযাপন করে। তাই তারা পোস্টারে ব্যানারে পত্র-পত্রিকায় বড় বড় করে লেখা শুরু করে দিল—

“আমরা শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের পক্ষে।”

মনলোভা শ্রোগানে মানুষ ভুলে গেল, গিয়ে দাঁড়াল তাদের পিছনে, ভরিয়ে দিল ভোটের বাস। আলালের ঘরের দুলালরা পৌছে গেল ক্ষমতা কেন্দ্রে। আরও খারাম আরও আরেশ কেন্দ্রে। তারা তো চৌত্রিশ বছর রাজসুখ ভোগ করল কিন্তু শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের কি হল। এল কী তাদের জীবনে নতুন কোনও দিকাল।

এই দ্রাস্তি বিলাস পর্বে আর এক সংযোজন দলিত। বলা হল এদেশের শাসন ক্ষমতায় উচ্চবর্ণ বলেই দলিতদের প্রতি এত অন্যায় অবিচার অপমান অত্যাচার। তাই দলিতের দল চাই, দলিত নেতা চাই, দলিতের হাতে রাজ ক্ষমতা চাই।

এক সময় সেটাও হল, নেত্রী দুশো কোটি টাকা ব্যয়ে রানী মহল বানালেন, কোটি কোটি টাকার মালাও পড়লেন তাতে দলিত জীবন বদলালো কোথায়!

একদিন নেত্রী শ্রোগান দিয়েছিলেন—তিলক রাজু তলোয়ার—মার শালে কো জুতা চার। পরবর্তীকালে সেই উচ্চবর্ণদেরই দলের টিকিট দিয়ে এম.এল.এ., এম.পি. মন্ত্রী বানিয়েছেন। প্রমাণ রেখেছেন—ভদ্রলোক ভদ্রলোক ভাই ভাই। শোনা যায় তার শাসনকালে থানায় ধানায় গোপন নির্দেশ দেওয়া ছিল—উচ্চবর্ণ আর দলিত বিবাদের কোনও কেস যেন নথিভুক্ত না করা হয়। যেন থানা থেকে মিটমাট করে দেওয়া হয়। নাহলে দলিত নেত্রীর শাসনকালের গায়ে কালিমালিপ্ত হবে বুদ্ধিপ্রাপ্ত পরিসংখ্যানের জন্য। ফলে ধর্মণের মত কেসও কিছু টাকা পরসাদ দিয়ে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে থানায় বসে।

পরীক্ষা অনেক হয়েছে আর পরীক্ষার সময় নেই। এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময়। দেখা তো গেল যে জাত ধর্ম ভাষা বর্ণ ভাঙিয়ে যারাই শাসন ক্ষমতায় গেছে শুধু নিজের স্বার্থের রুটি মেকছে। এবার নির্বাচিত করা হোক ষাট উত্তীর্ণ সেইসব লোককে—বিগত চল্লিশ বছরের জনহিতকর কাজকর্মের নিরিখে—তুল্যমূল্য বিচার করে।

জালালুদ্দিন গাঁজি—যে আগে ফুটপাতে থাকত রিকশা চালাত পরে চালায় ট্যাক্সি। আর এইভাবে সে গড়ে তুলেছে একটা স্কুল। সাড়ে তিনশো ছাত্র পড়ে সেখানে। গড়েছে একটা বৃদ্ধাবাস একটা আবাসিক ছাত্রাবাস। সময়ের কণ্ঠি পাথরে পরীক্ষিত একজন খাটি মানুষ জালালুদ্দিন গাঁজি। এরকম মানুষ এদেশে

অনেক আছে। এদের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া দরকার।

মনে রাখা দরকার যে পরীক্ষিত প্রমাণিত খাটি মানুষ ছাড়া যদি কারও হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় বা কৌশলে ক্ষমতা পেয়ে যায়—সে যদি দলিতও হয়—দলব হয়ে যেতে পারে। মহেন্দ্র বর্মা একজন আদিবাসী—সে অত্যধিক ক্ষমতা পেয়ে দলভারখোর গোভ মুরিয়া আদিবাসী জীবন সম্পত্তি সম্বন্ধে কীভাবে ধ্বংস করেছে সে তো আমরা সবাই জানি। সাগওয়া জুদুম নামে একটা বাহিনী বানিয়ে কয়েক হাজার গ্রামের উচ্ছেদ, শত শত খুন ধর্ষণ অগ্নি সংযোগ কী না করেছে!

এই শতাব্দীর সবচেয়ে বর্বর নৃশংস যে নরসংহার—শোনা যায় চার হাজার সাতশো আটশ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল মরিচঝাঁপি নামক সুন্দরবনের এক ধীপে। অর্ডার তো উচ্চবর্ণ মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিল কিন্তু অতি উৎসাহে হত্যা ধর্ষণ অগ্নি সংযোগের কাজটা সুসম্পন্ন করেছিল যে দুই পুলিশ অফিসার তার একজনের পদবি সামন্ত আর একজন নস্কর। অর্থাৎ দু'জনই নিম্নবর্ণ। তাদের অধীনে যে বিশাল পুলিশ বাহিনী ছিল দু'চার জন উচ্চবর্ণ থাকলেও বড় ভাগ যে নিম্নবর্ণ—তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন একটাই—এই সময় তাদের স্বজাতি প্রেম কোথায় গিয়েছিল? নিরম বুদ্ধক দেশ ভিখারী দরিদ্র দলিত মানুষগুলোর উপর অমানুষিক অত্যাচার করার বেলা বুকটা একটু কাঁপল না, কান্দল না দুটো চোখ? এখন তো শুনি সেই সামন্ত মাহিষ্য কমুনিটির এক নেতা বনে বসে আছে। উদ্ধার করবে সে ওই দলিত মানুষগুলোকে?

আমি যে অঞ্চলে বাস করি আগে এখানকার জমিদার ছিল এক মডল এক নস্কর। দু'জনের কেউ উঁচু জাত নয়। এই সমগ্র অঞ্চলটায় মৎস্যজীবী-দলিত-অজ্ঞ-বাগদি জনগোষ্ঠীর বাস। কী কুট কৌশলে তাদের সব জমি এরা গ্রাস করেছিল আর তাদের উপর কী ভীষণ অত্যাচার চালিয়েছিল শুনলে শিউরে উঠতে হয়। এখনও এমন লোক আছে যার দেহের শংকর মাছের চাকুকের দাগ সেই অত্যাচারের সাক্ষ্য দেয়। এইসব অত্যাচার এই কারণে করতে বিবেকে বাধেনি, ওরা ভদ্রলোক এরা ছোট লোক।

এইসব ছোট লোকের ভোট জিতে রাজগদিত বসে ভদ্রলোকে। ভোটের প্রয়োজনেই এরা কেউ শ্রমিক কৃষকের নাম জপে কেউ দলিত দরদি সাজে। যাত্রাপালার মঞ্চে যেমন কেউ লেনিন কেউ আত্মদেবকর হয়, যাত্রা শেষে সব

পরিচয়—নট। এদেরও তেমনি ভেটি বৈতরনী পার হবার পর এক পরিচয়—ভদ্রলোক। জ্যোতি বসু আর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়—দুই দলের দু'জন সেনাপতি। সেই বাহাদুর সালে দু'দলের সেনারা লড়াই করে কত যে মরেছে। তবু এদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট। একেই বলে ভদ্রলোকের ভদ্রতা। এই তো সেদিন দলিত নেত্রী—দলিত নিখনকারী দলের নেতার সাথে ভদ্র ভাবে তৃতীয় ফ্রন্ট করেছিলেন। যেই তারা বলেছে—তোমাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে মরিচঝাঁপির নিহত মানুষের মুখগুলো আর মনে থাকেনি।

সম্প্রতি টিভি পত্র-পত্রিকায় বিহারের এক বি.এস.পি নেতা এবং তার স্ত্রীর বিষয়ে ব্যাপক হৈচৈ হল। তারা তাদের বাড়ির বারো তের বছরের একটা কাজের মেয়েকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তার অপরাধ মনিবের আদেশ এবং ইচ্ছার অনুগত যথেষ্ট কাজ করত না। তাদের বিচারে এটা অমার্জনীয় অপরাধ।

নিজের অভিজ্ঞতায় জানি—এইসব ভদ্রলোকের বাড়িতে যখন কাজের জন্য “কি” চাকর আনা হয়—তাদের মা বাপকে এরা বলে নাই তেমন কিছু করতে হবে না। আমাদের বাড়িতে আমাদের ছেলে-মেয়ের মতই থাকবে। আমরা যা খাই তাই খাবে আমরা যা পড়ি তাই পড়বে, আর টুকটাক একটু ফাই ফরমশ খাটবে।

তারা যা খায় কাজের লোক সেটাই খাবে, তবে বাড়তি পড়তি এটো বাসি। তারা যা পরে সেটাই পরবে দু-তিন বছরের পুরানো হলে পোচড়া বানাবার দিন কয়েক আগে। আর টুকটাক কাজ। সে যে কেমন দুরমুশ টের পাবে কাজের লোক একবার এসে পড়বার পর। হকুমের কোনও বিরাম থাকবে না। শাস্ত ক্লাস্ত হয়ে গেলে—কাজ করতে অস্বীকার করলে-বকুনি-মার। এই তো সেদিন একটা ছোট্ট মেয়েকে সারা গায়ে ছাঁকা দেওয়া, মাথা ফটা অবস্থায় এক ক্লাবের ছেলেরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এই শহর কলকাতায়।

এখানে এই ব্যাপারে নিম্নবর্ণের ভদ্রলোক আর উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে কোনও ভেদাভেদ নেই। ছোট লোকদের প্রতি সব সমান নির্মম। এরা জানে কোন আইনকানুন তাদের কিছু করতে পারবে না। তাকে রক্ষা করবে আর্থিক সক্ষমতা এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি।

এই ভদ্রলোক বুকের বাইরে যে বিপুল বিশাল ছোটলোক মানুষের অবস্থান—

তারা বাস করে রেল বস্তি খালপাড় ফুটপাথে বা প্রত্যন্ত কোনও গাঁও গেরামে। যাদের জাতি পরিচয় নমো পোদ কাওরা বাগদি হাড়ি মুচি জেলে মালা ডোম মেথর। নিচে থেকে কিছুলোক যেমন উঠে উঠে গেছে, উচ্চবর্ণের কিছু লোক বিবিধ বিপর্যয়ে পিছলে নেমে এসেছে এদের মধ্যে। ফলে এই সমাজটার একটা অন্য নাম হয়ে গেছে—কিছু সমাজ বিজ্ঞানী যাদের গালভড়া নামে বলেন—সাব আলটার্ন।

এই নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণ সমাজকে দেয় রাগ জ্বালা ঘৃণা মিশ্রিত সেবা। আর উচ্চবর্ণ এদের দেয় অবজ্ঞা অবহেলা অপমান অত্যাচার মিশ্রিত মজুরি। এখানে কেউ কারও বন্ধু নয় দু'দলের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক ভয় সন্দেহ অবিশ্বাস। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর মোছার কাজ সারতে এসে কাঁপছেই “বি” মেয়েটা। কাঁকা ঘরে একা পেয়ে বাবুটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো। “কি” মেয়ের আগুন ঝরা চোখ দেখে মনিব গিল্লির বুক দুক দুক—কেউ কাছে পিঠে নেই, আমার গলা টিপে দিয়ে সোনা গহনা নিয়ে যদি পালায়! দুই তরফেই অশঙ্কায় যথার্থ কারণ আছে।

দলিত সমাজ থেকে উঠে ওঠা—সমাজ দরদি বলে দাবি করা বেশ কিছু ব্যক্তির সাথে কথপোকথনে প্রকাশ পায়—এরা তীব্রতম মার্কসবাদ বিরোধী। সারা পৃথিবীর সমস্ত সংবেদনশীল মানুষ এটা মানে যে, কার্ল মার্কস একমাত্র মানুষ যিনি শ্রমিক কৃষক দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের দুঃখ কষ্ট নিয়ে কোনও কাব্য করেননি। তিনি বস্তুবাদি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার উৎস পৌছে তার সমাধানের একটা কার্যকর পথ পছন্দের দিক নির্দেশ দিয়েছেন। যাকে বিন্দু জনেরা বলে থাকেন মার্কসবাদ।

তিনি যে কালে যে দেশের মানুষ—যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্যের আদান প্রদান সবকিছু সঠিকভাবে করে উঠতে পারেননি। কোনও একজন মানুষের পক্ষে সারা পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে জানা একটা অসম্ভব ব্যাপার। ফলে ভারতবর্ষের উগ্র বর্ণবাদ বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও তথ্য ছিল না। বহুমুখী শোষণ আর দমন-দলন এসব প্রসঙ্গে তাই তিনি ততটা মুখর হতে পারেননি। এর থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে তিনি বর্ণবাদের সমর্থক। তিনি যে বিশাল প্রোলেতারিয়েত শ্রেণির কথা বলেছেন, তার মধ্যে তো দরিদ্র এবং দলিত শ্রমজীবী সব মানুষ আছে। এই শ্রেণির স্বার্থে

দ্রুত এবং কার্যকরী যে সমাজ গঠনের জন্য সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন সেখানে আর না হোক অন্তত দলিতদের বিরোধিতা করার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আশ্বেদকর যাদের দলিত বলছেন আর মার্কসবাদীরা যাদের সর্বহারা কয়, যদি এ দেশে বিপ্লব হয়, প্রাপ্তির অংক উহ্য রেখে এটা তো বলাই যায় অন্তত হারাবে না তারা কিছুই। তাহলে দলিত পরিচিতির কোন কোন তাত্ত্বিক এত বিবোদগার করে কেন?

এখানেই রয়েছে ক্লাশের মধ্যে কাস্ট আর কাস্টের মধ্যে ক্লাশ এই তত্ত্বের প্রতিফলন। দেখা যাবে যে দলিতরা মার্কসবাদের বিরোধিতা করেছে তারা দলিত ভাস খেলে দেশ রাষ্ট্রের কাছ থেকে বহুকিছু পেয়ে গেছে। সেই যে কাল যখন তার মা কাঁচড়ে কটা শুকনো মুড়ি দিয়ে স্কুলে পাঠাতো সে কাল বহু পিছনে চলে গেছে। এখন তার কাছে ভোগবিল্যাসের অটেল উপকরণ। তাই সে ভয় পায়—যদি কোনওদিন মার্কসবাদ বর্ণিত সমাজ এসেছে আসে, যদি বিপ্লব হয়, তাহলে তাকে অনেক কিছু খোয়াতে হতে পারে। তখন দাস দাসি চাকর বাকর ড্রাইভার দারোয়ান রাধুনি মেথর—কিছুই কাছে থাকবে না নিজের সব কাজ নিজে করে নিতে হবে। তাই তারা মার্কসবাদ বিরোধী।

আমি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে একখানা ক্যালেন্ডার দেখেছি। শুনেছি নাকি ইন্টারনেটেও আছে। এটি ছাপিয়ে বিলি, বিক্রি করছে দলিত সমাজের আশ্বেদকরবাদীরাই। প্রত্যেকটা ছবির একটা নিজস্ব বার্তা, বক্তব্য থাকে তার কিছুটা প্রকাশ্য, কিছুটা গুপ্ত। সেই যেমন আমাদের বাউল ফকির দরবেশরা সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে ধর্মের গুঢ় রহস্য সাধারণ মানুষের পক্ষে অবোধ্য দুর্বোধ্য রেখে স্বপক্ষদের জানিয়ে দিত, এই ক্যালেন্ডারেও তেমন একটা বার্তা আছে। আমার তেমন মনে হয়। না হলে আশ্বেদকর সাহেবের এত সুন্দর সুন্দর ছবি থাকতে এক তৃতীয় শ্রেণির ছবি আঁকিয়ের এই ছবিকে এত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার প্রসার কেন করা হবে।

একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়িটা টানছে দুটো সাদা ঘোড়া। গাড়িতে বসে আছেন বাবা সাহেব আর তার বাদিকে বসে আছেন সবিতা আশ্বেদকর। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে। সব একাগাড়িতে দেখা যায় চালক আরোহীর সামনে বসে। সেটাই চিরকালের নিয়ম। এখানে চালক লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরোহীর পিছনে।

প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যিকারের কোনও গাড়োয়ান গাড়োল না হলে ভিড় রাস্তায় এভাবে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করবে না। এখানে চালাচ্ছে, কারণ এটা একটা ছবি। বিশেষ বার্তাবাহী ভাষার চিত্র।

গাড়োয়ান লোকটার বয়স যাটের কাছাকাছি। শরীর কৃশ। গায়ের জামায় একটা দুটো তালিমারা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দৃষ্টিতে একটা সর্বস্ব হারানো রিক্ততা। পিঠে তার একটা বোচকা বাঁধা।

এবার চেষ্টা করা হোক সাংকেতিক ভাষায় কী বার্তা দেওয়া হচ্ছে তার মর্মেচ্ছারে। এই যে একগাড়ি এটাই হচ্ছে এই দেশ, এই সমাজ। গাড়ি আর ঘোড়া, ঘোড়া হচ্ছে গতির প্রতীক। ঘোড়ার টানে গাড়ির এগিয়ে চলেছে অর্থাৎ সমাজটা এগিয়ে চলেছে। সমাজের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে নিম্নবর্ণ থেকে উঠে ওঠা সুট বুট পরিহিত সচ্ছল শিক্ষিত। তার বাঁদিকে, বাঁদিকটাকে ডানদিকের চেয়ে হিন্দুভাব ধারায় হেয় মনে করা হয়। সেই বাঁদিকে বসে আছে সে—যে উচ্চবর্ণ হয়েও নিম্নবর্ণকে স্বামী অর্থাৎ প্রভু মনিব মালিক অধিপতি স্বীকার করে নিয়েছে।

বার্তাটা এই উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণ ভদ্রলোকেরা পাশাপাশি বসে এগিয়ে যাবে। কেউ তাদের কাউকে অসহ্য মনে করবে না। আর এদের পিছনে থাকবে লক্ষ কোটি নির্ধন নিরক্ষর নিম্নবর্ণ। গাড়োয়ান তারই প্রতীকী রূপ। এই শ্রেণির মানুষ আগে শুধু উচ্চবর্ণদের সেবা করত, করুণা পাবার আশায় এখানে পারিশ্রমিকটাই করুণা, এখন নিম্নবর্ণের উচ্চলোকদেরও সেই মান্যতা দেবে। এমনই একটা ব্যবস্থা চায় শিক্ষিত সচ্ছল দলিত বুদ্ধিমানরা। মার্কসবাদের সমাজ এর অনুমোদন দেয় না। এই কারণেই এরা মার্কসবাদ বিরোধী।

বিপ্লব হোক বা না হোক সাম্রাজ্য আসুক বা না আসুক সবচেয়ে যেটা বাজে ব্যাপার—পুঞ্জির অধিপতি মানুষ জনকে মার্কস বলেছেন, সমাজ শত্রু, শ্রেণি শত্রু। মার্কসবাদের কারণেই বুর্জোয়া—যার সমার্থক শব্দ বিত্তবান, সাধারণ মানুষের চোখে চোর জোচ্চর ঠগ জালিয়াত। আগে রাজা মহারাজা জমিদার ধনবান মানুষকে লোকে যে শ্রদ্ধা সম্মান দিত, প্রশংসা করত, আর এখন করে না, ছুরু কুঁচকে তাকায়, মনে মনে ঘৃণা করে। তাই এদের চোখে মার্কস মহান কোনও ব্যক্তি নয়, মার্কসবাদ বাজে জিনিস।

লোকে যত ঘৃণা নিন্দা করুক যে লোকটা সুদে ঢাকা খাটায়, বন্ধকের কারবার

করে তার কাছে সেটা ব্যবসা। কখনওই তার কোনও অনুশোচনা হবার নয়। তেমনই যারা প্রভুত ধন সম্পত্তির মালিক—মানতেই চাইবে না—ওসব অন্যায় উপার্জন। কেউ হয়তো বলবে, আমি চাকরি করেছি সব আমার পরিশ্রমের কামাই। তাহলে অন্যায় কোথায়!

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাকে মার্কসবাদের কাছে যেতে হবে। রাষ্ট্র কী? মার্কসবাদীরা সবাই জানে, রাষ্ট্র হচ্ছে একশ্রেণির দ্বারা আর এক শ্রেণিকে দলন দমন শাসন আর শোষণ করার সুচারু ব্যবস্থা। তো সেই শাসন আর শোষণ সুসম্পন্ন করার জন্য একদল লোকের দরকার পড়ে। এরই হচ্ছে সরকারি কর্মচারী। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি থেকে পঞ্চায়েতের চাপরাশি সব সেই শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। কেউ প্রত্যক্ষ কেউ পরোক্ষভাবে। গানশেল ফ্যাক্টরির কর্মী, সে কাউকে মারে না বাটে তবে তার বানানো গুলি বাঁধরা করে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ না হতে চাওয়া আদিবাসীর বুক। সে দোষী নয়, দোষী এই শাসন ব্যবস্থা। যার সাথে সে যুক্ত।

এই যে সরকারি কর্মচারী, বাধ্য বিনীত আজ্ঞাবহ যন্ত্রমানব রাষ্ট্র এদের হাতে রাখার জন্য যা বেতন দেয়—যোগ্যতার তুলনায়, প্রয়োজনের তুলনায়, পরিশ্রমের তুলনায় অনেক বেশি। সারা দেশের লোককে শোষণ করে যে বিপুল ধনরাশি জমা হয় তারই কিছু অংশ বিলিয়ে দেয় অনুগত সহায়তাকারীদের মধ্যে। এভাবে তাদের হাত করে রাখে সরকার।

আগে এখানে অধিপত্য ছিল উচ্চবর্ণদের। সংরক্ষণের দৌলতে কিছু নিম্নবর্ণও সুযোগ পেয়ে গেছে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন, দলিত সমাজের যারা শিক্ষিত—নেতা, মাথা, বলিয়ে, কইয়ে, লিখিয়ে সবাই মাত্র একটা বিষয় সংরক্ষণের দাবি নিয়ে বড় সোচ্চার। পানীয় জল বিদ্যুৎ পরিবহন স্বাস্থ্য শিক্ষা দ্রব্যমূল্য একশো দিনের কাজ মিড ডে মিল, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম জঙ্গলমহল নোনাডাঙা—নিম্নবর্ণ জীবনের সাথে সম্পর্কিত কোনও কারণেই তারা বিচলিত হন না। শুধু তাদের একটাই দাবি, যে মহামান্য সরকার তোমার অনুগ্রহে উচ্চবর্ণের লোকজন সারা দেশের জনগণকে চুষে পেট মোটা করছে, আমাদেরও সেই সুযোগ দাও। আমরাও লেখাপড়া

শিখেছি, কথা দিছি আমরাও তোমার বাধ্য বিনীত আজীবন হয়ে থাকব, সব কাজে সব সময় সহযোগ দেব। কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করব না।

আমরা যাদের শোষক বলি, বুর্জোয়া বলি, গুণতীতে যাদের সংখ্যা পঁচিশি জন, সেই টাটা বিড়লা গোয়েন্দা ডালমিয়া—যাদের অনুদানে রাজনৈতিক দলের তহবিল ভরে, যাদের অঙ্গুলি হেলনে সরকার গড়ে, সরকার পড়ে, তাদের এসব জাত-পাত নিয়ে মাথা ব্যথা নেই—মুনাফা কামাতে পারলেই হল। তারা সেই দল, সেই ব্যক্তি, নেতা, কর্মী চায় বা বানিয়ে নেয় যে তার স্বার্থ দেখবে। মনমোহন মোদী মমতা মার্যাবতী যেই গদিতে বসুন, ব্যবস্থার তত্ত্বাবাহক হতে হবে। তা না হলে আজাদ হও। ফলে সরকার নীতিগতভাবে জাত বর্ণ ধর্ম ভাষা এসব বিষয়ে নিরপেক্ষ। তবে কোনও কোনও ব্যক্তি বিশেষ আচ্ছন্ন থাকলে অসহিষ্ণু হন, সরকারি পদ ক্ষমতা বলে সেই মনোভাবের প্রদর্শন করেন। সেটা সত্যি তবে বিরটি কিছু নয়।

আমার যেটুকু জানা বোকার ক্ষমতা, তাতে এটুকু বুঝতে পারি যে কার্ল মার্কস যাকে শ্রমিক কৃষক সর্বহারা অর্থাৎ প্রলোভিতারিয়েত বলে চিহ্নিত করেছেন, আর আন্দোলনকার যাকে দলিত বলেছেন সেই নিম্নবর্ণ নির্ধন শ্রমজীবী জনগণ—আলাদা কিছু নয়। এবং মার্কসবাদ ও আন্দোলনকারদের মধ্যে খুব একটা বড় বিরোধ বিবাদ মতানৈক্য বা বৈরিতা নেই। থাকার কথাও নয়।

তাহলে যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন, শ্রমিক কৃষক সর্বহারা জনগণের বন্ধু বলেন, তারা তো আন্দোলনকার বিরোধী হবার কথা নয়। এটাই একটা বড় বিভ্রমনা যে তারা তাই। এটা কেন?

সোভিয়েত যোগীন সেনগুপ্ত বলেন, সব মানুষের অর্থের প্রতি লোভ মোহ আকর্ষণ থাকে না। এমন অনেকে আছেন যারা সামান্য কিছু সচ্ছলতা পেয়ে যাবার পর—নাম যশ খ্যাতি নেতৃত্ব কর্তৃত্ব আধিপত্য বিস্তারের নেশায় বঁদ হয়ে ওঠেন। এই নেশা বড় ভয়ঙ্কর নেশা, যা সব নেশার উপরে।

এককালে যে সব ধনবান বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে লোক কমিউনিস্ট পার্টি করতে এসেছিল—আজ তো প্রমাণিত যে এদের অনেকেই সত্যিকারের সর্বহারা দরদী ছিল না। এসেছিল শুধু ওই নাম যশ খ্যাতি নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করবার মোহে, নেশায়।

আজকে তো জিন নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। প্রমাণিত হয়েছে যে ওই জিনই বহন করে নিয়ে আসে মানুষের সব প্রবণতা। ফলে তার ওই জিন সংবাহক নেতাগিরির নেশা তাকে নেতা বানাতেই। যদি তার জন্ম উত্তরপ্রদেশে হতো বলা যায় না হয়তো সে রমনবীর সেনার নেতা হতো কিনা, মহারাষ্ট্রে জন্মালে বসবাস করলে জয় মহারাষ্ট্র বলে গর্জে উঠত কিনা। বাংলায় জন্মেছে এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি বিবিধ ঘটনাক্রমে কমিউনিস্ট দলে ভিড়িয়েছে। তার আর্থিক সামাজ্য শিক্ষা সর্বপরি বর্ণ অহঙ্কার অবচেতনে তাকে দিয়েছে এক ভ্রম—আমি সবার চেয়ে বড় সবচেয়ে বুদ্ধিমান-বিবেচক-যোগ্যতর। এইখানে তার মনোকষ্টের কারণ ঘটছে আন্দোলনকার। যে মতবাদ বলে, রাষ্ট্র পরিচালনায়, পার্টি পরিচালনায়, সমাজের সর্বস্তরে যে জাতির যত জনসংখ্যা সেই অনুপাতে ভাগীদারি চাই। এর অর্থ যত অশিক্ষিত বর্বর চাষাভূষা ছোট জাত সব আমার সমকক্ষ হয়ে যাবে যে। এটা অন্যায়। সংখ্যাধিক্যের জোরে তাদের মত, দাবিকে স্থান দিতে হবে আমাদের মত দাবির উর্ধ্বে। এটা অসহ্য। অতএব গোড়া কাটো। বলো আন্দোলনকারটাই ভুল অদরকারি। বলো বর্ণবাদ কিছু নয়, আসল হচ্ছে বর্ণ সংগ্রাম। এইসব ছল বল ঘারা এভাবেই নেতৃত্ব কর্তৃত্ব আধিপত্যবাদকে সংহত সুরক্ষিত রেখে দিতে সচেষ্ট হয়েছে তারা এবং সফলও হয়েছে।

মার্কসবাদ বস্তুবাদী বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি মতবাদ। এখব পর্যন্ত শোষিত বঞ্চিত মানুষের কাছে এর চেয়ে উন্নত, কার্যকর আর কোনও দর্শন নেই যাকে অনুসরণ করে মানবিক অধিকার সমূহ প্রাপ্ত করতে পারে। তবে এটা ঠিক যে ওই মতবাদ প্রয়োগে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। যে কারণে রাশিয়ায় ওই মতবাদের সাথে সে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ভৌগোলিক বহুবিধ বিষয়কে মাথায় রেখে সংযুক্ত করতে হয়েছে অন্যকিছু মত। যাকে বলা হয় লেনিনবাদ। আবার সেই মতবাদ চীন দেশে গেলে সেই দেশের অবস্থা অবস্থান বিচার বিশ্লেষণের পর মাও সেতুং কিছু সংযোজন ঘটান—যাকে বলা হয় মাও সেতুংয়ের চিন্তাধারা বা মাওবাদ। এইভাবে ভিয়েতনাম কিউবা সব দেশেই তার নিজস্ব সমস্যার নিরাকরণে সংযোজন-বিশেষ ঘটতে বাধ্য হয়েছে। দুর্ভাগ্য ভারতীয় শোষিত বঞ্চিত জনগণের যে এদেশে তেমন কোনও চিন্তাবিদ-নেতা-দরদীর জন্ম হয়নি যে মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও সেতুংয়ের চিন্তাধারার নির্বাসের সাথে ভারতবর্ষের জগন্নাথ মাটি মানুষ

সংগ্রাম সংস্কৃতি সবকিছুকে ছেনে-ছেকে এমন কিছু সংযোজন ঘটাবে যাতে এমন এক কমিউনিস্ট দল গড়ে ওঠে যা প্রকৃতপক্ষেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। যাত্রাপালার বানানো বিবেক নয় সত্যিকারের বিবেক।

আর সেটা করতে হলে যে সমস্যা ভারতবর্ষের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা, সেই বর্ণবাদকে অন্ধের মত অস্বীকার না করে সাহসের সাথে সমাধানের কথা ভাবা উচিত ছিল। এইখানে আত্মদকরবাদ হতে পারত মার্কসবাদের আর একটা বাত। সেটা হলে কমিউনিস্ট পার্টি তাদেরই পার্টি হয়ে উঠত যাদের হওয়া উচিত। শ্রমিক কৃষক সর্বহারা অর্থাৎ কামার কুমোর জেলে মুচি মেথর চাষাভুষো মুটে মজুর। সেটা হয়নি। আর হয়নি বলেই মাটিতে যাতে ঠেকে না চরণ সেই বাবু ভদ্রলোক অর্থাৎ বামুন কায়েত বন্দিদের দল হয়ে রয়ে গেছে। যেমন আছে আর পাঁচ দশটা ভোটবাজ, ক্ষমতা লোভী দল।

আমি বিশ্বাস করি একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই পারে মানুষের সব মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে। আর তাই স্বপ্ন দেখি সেই কমিউনিস্ট দলের একজন চাষি-ক্ষেত মজুর সারাদিন কাজ করে খুলো কাটা মাখা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে পলিটব্যুরোর মিটিংয়ে যোগ দিতে। একজন মজুর জবজবে ঘাম গামছায় মুছে বক্তব্য রাখছে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে। সে থামলে কোনও কামার কোনও কুমোর অবশ্যই যারা জাতিগত ভাবে নিম্নবর্ণ বলে যাচ্ছে সেই দিশা নির্দেশ যে পথে পার্টি চলবে।

কমিউনিস্ট পার্টিটা এমন পার্টি হলে মরিচকাপি নকশালবাড়ি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম নেতাই জঙ্গলমহল—কোথাও কোনও দলিত দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের উপর এমন অত্যাচারের ঘটনা ঘটত না। সে হয়ে উঠত এদের সত্যিকারের দরদী বন্ধু।

এটাই এদেশের দুর্ভাগ্য যে অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিও এদেশে পুঁজিপতিদের সেবাদাস।

□

শ্রেণী এবং বর্ণভেদ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ - একটি পর্যবেক্ষণ

কণিষ্ক চৌধুরী

সমাজকে বোঝার তাগিদ থেকেই সামাজিক শ্রেণীগুলিকে বোঝার দরকার। এই কারণেই সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং মার্কসীয় চর্চায় শ্রেণী সংক্রান্ত আলোচনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। পূর্বোক্ত শৃঙ্খলাগুলিতে 'শ্রেণী'-কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুসংবদ্ধভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং এর উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। বিবেকানন্দ যেহেতু প্রচলিত অর্থে সমাজদার্শনিক ছিলেন না, তাই তাঁর বাণী ও রচনার মধ্যে 'শ্রেণী' ভাবনাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলিকে সংগ্রহিত করে সুসম্বন্ধিত ধারণা কাঠামো গড়ে তোলা একটি নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। প্রয়োজন অনুসন্ধান ও খননকার্য—যার মধ্যে দিয়ে তাঁর ভাবনার মূল ধারাটিকে, প্রধান বৌদ্ধটিকে বোঝার চেষ্টাই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। শ্রেণী সম্পর্কিত তাঁর মতটি বোঝার জন্য যুঁজতে হবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সমূহের মধ্যে, উত্থান-পতনের মধ্যে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে। কারণ এই সবই তাঁর মনন-বিশ্বকে প্রভাবিত করেছিল, তাকে সুনির্দিষ্ট অবয়ব দিয়েছিল।

(১)

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪, নরেন্দ্র (পরে বিবেকানন্দ) পিতা বিশ্বনাথ দত্তকে হারালেন। তরুণ নরেন্দ্র ছিলেন এক প্রাণবন্ত যুবক। তিনি আঙা মারতেন, গান করতেন, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন, খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসতেন, মেতে থাকতেন হাসি-ঠাট্টায়। বিশ্বনাথের মৃত্যু তাঁকে দীড় করিয়ে দিল রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি। তিনি কুবলেন 'এ জীবন স্বপ্ন নয়'। ধর্মীর সন্তান একদিনেই পরিণত হলেন চরম দরিদ্রে। বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : "বক্তৃত বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর কেউ তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে

একটি কপদক নিয়েও সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলো না। অথচ কলকাতায়ই আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা ছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর সকলেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সমাজ, আত্মীয়-স্বজন আমাদের কথা বিস্মৃত হল! প্রতিযোগিতাময় পৃথিবীতে জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম।” (১৪০০ বাংলা : ৮১)।

যুবক নরেন্দ্র স্বপ্ন দেখতেন বিলেতে গিয়ে আইন পড়বেন। (পূর্বোক্ত : ১০৮)। পিতার মৃত্যুতে স্বপ্নভঙ্গ হল। চেষ্টা করেছিলেন চাকরির। সেখানেও প্রাপ্তির অঙ্ক শূন্য। রামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য কথামতকার মহেন্দ্র গুপ্তের চেষ্টায় বিন্যাসাগরের স্কুলের বৌবাজার শাখায় শিক্ষকতার কাজ পেলেও কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সেখান থেকে কর্মচ্যুত হন। তারপর বিভিন্ন লোকের দরজায় দরজায় ঘুরেও তিনি চাকরি পাননি। ফলে দারিদ্র্যের অস্ত্রহীন বৃন্তের মধ্যে তিনি আবর্তিত হতে থাকেন। সম্প্রতিবান অ্যাটর্নীর সন্তান নরেন্দ্র টের পেলেন ক্ষুধা কাকে বলে, দারিদ্র্য কি জিনিস। ব্যক্তিগত জীবনের এই নিদারুণ অভিজ্ঞতাই হয়তো তাঁকে দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। পরিত্রাজনের বহু আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—দরিদ্রের প্রথম প্রয়োজন খাদ্য।

পিতার মৃত্যু, অসহায়তা, সাংসারিক অনটন, বড়লোক হওয়ার ক্ষেত্রে স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদি রামকৃষ্ণের সাথে নরেন্দ্রের নৈকট্য বৃদ্ধি করে। ১৮৮৪-৮৬ পর্বে নরেন্দ্র যেমন রামকৃষ্ণের কাছে গেছেন, তেমনি রামকৃষ্ণও তাঁর কাছে গেছেন বহুবার। এসময় নরেন্দ্রের কাছে রামকৃষ্ণ ছিলেন খানিকটা আশ্রয়ের মত। কিন্তু সে আশ্রয়ও তিনি হারালেন কয়েকদিনের মধ্যে। ১৮৮৬-র ১৬ আগস্ট গলায় ক্যান্সার রোগে রামকৃষ্ণ মারা গেলেন। ফলে আবার তিনি অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়লেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণের শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে গুরু হয়ে যায় দলাদলি। বরানগর মঠের পরিস্থিতিও নরেন্দ্রের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই বেরিয়ে পড়েন পরিত্রাজনে। এই পরিত্রাজনের প্রথম পর্বে (১৮৮৭-১৮৯১) বারবার বিভিন্ন কারণে (অসুস্থতা, মামলা, বোনের মৃত্যু) তাঁকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে (১৮৯১-৯৩) তিনি আর কোনওভাবেই কলকাতায় বা বরানগর মঠে ফিরে আসেননি। যখন ফিরলেন তখন তিনি আর নরেন্দ্র নন, তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দে।

পরিত্রাজনের এই দ্বিতীয় পর্বে তিনি পায়ের তলায় খানিকটা শক্ত মাটি পেয়ে যান। এই পর্বে তাঁর অনিশ্চিত জীবনের অবসান ঘটে। কারণ এই সময়েই রাজা, মহারাজ, জমিদার, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি ও ধনী ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে সক্ষম। সক্ষম হন তাদের প্রভাবিত করতে। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত দারিদ্র্যের অবসান ঘটে। এখন তাঁর নজরে পড়তে থাকে নিম্নবর্ণের দরিদ্র ও দুঃখ। কারণ এই পর্বেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানুষের ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য ও নিম্নবর্ণের উপর প্রবল অবিচার ও অন্যায়। তিনি খেতড়ি নিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে ২০ ডিসেম্বর, ১৮৯২-এ একটি চিঠিতে লেখেন : “সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন কি হাস্যকর অবস্থাতেই না উপনীত হইয়াছি। ভাঙ্গীরাপে যদি কোনও ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সংক্রমক রোগের ন্যায় সকলে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে; কিন্তু এখনই পাদ্রী সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়িয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা জামা (যতই ছিন্ন ও জর্জরিত হউক) পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়িতে প্রবেশাধিকার পায়। ইহার চেয়ে আর অদৃষ্টের পরিহাস কতদূর হইতে পারে? এখন এই পাদ্রীরা দক্ষিণে কি করিতেছে, দেখিবেন—আসুন দেখি। উহার লাখ লাখ নীচ জাতকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশি, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী, এবং খ্রীলোকেরা—এমনকি রাজবংশীয় মহিলাগণ পর্যন্ত—ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকিভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। আর আমি তাহাদের দোষও দিতে পারি না। তাহাদের আর কোন বিষয়ে কি অধিকার আছে বলুন? হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইয়ের ন্যায় দেখিবে?” (বিবেকানন্দ : ১৯৭৭ : ৫৬)।

চিঠির উদ্ধৃত অংশটিতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি দরিদ্রের উপর অত্যাচারের অবসান চাইছেন। আর ব্রাহ্মণদের চিহ্নিত করেছেন অত্যাচারী হিসেবে। শুধু তাই নয় তিনি ব্রাহ্মণদের জাতিগত উচ্চ অবস্থানের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথাও চিহ্নিত করতে ভোলেননি। আবার দরিদ্র শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ভাঙ্গীদের। অর্থাৎ তাঁর সমীকরণটি হল—উচ্চবর্ণ ও

উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্ণ (এখানে ভাঙ্গী) গণ শোষিত অত্যাচারিত। এই ভাবে তাঁর কাছে সামাজিক শ্রেণী (বর্ণ) ও বর্ণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চিঠির এই অংশের শেষ বাক্যটিতে তাঁর মানবিক আকৃতি চরম প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে তিনি চেয়েছেন, প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষকে ভীতি হিসেবে দেখুক।

কিন্তু একটি বিষয় এড়িয়ে গেলে চলবে না। তা হলো উচ্চবর্ণ ও সম্প্রদায়িক শ্রেণী হিসেবে ব্রাহ্মণদের এই অত্যাচারের ফলে দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মানুষ দলে দলে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই ধর্ম পরিবর্তন বিবেকানন্দের অন্যতম কষ্টের কারণ। ফলে দুটি সমস্যা থেকেই যায়—প্রথমত, এই দরিদ্র নিম্নবর্ণের মানুষ যদি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করতেন, তাহলে বিবেকানন্দের কাছে তা কতটা কষ্টের হত। দ্বিতীয়ত, বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের সাথে আর্থিক ক্ষমতার এই সংযোগে দরিদ্র নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের শোষণ ও অত্যাচার কি হিন্দুধর্মের অন্যতম লক্ষণ নয়?

অন্য আর একটি চিঠিতে (১০ জুলাই, ১৮৯৩) বিবেকানন্দ আলাসিন্সা সহ অন্যান্য মাদ্রাজী ভক্তদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হতে, ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে এবং বিশেষ করে ‘দুই পুরুতওলোকে দূর করে’ দেবার জন্য। (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ৭২)। কিন্তু কোথাও পুরোহিততন্ত্রের ভিত্তি যে হিন্দুধর্ম ও বর্ণব্যবস্থা তাকে আক্রমণ করেননি বলেননি যে মানুষের দারিদ্র্যের কারণ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো। অর্থাৎ উপরিতলে দৃশ্যমান মানুষের যন্ত্রণা দেখে তিনি কাতর হলেও তাঁর সঠিক কারণগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে তাঁর যথেষ্ট দ্বিধা ছিল—একথা অনস্বীকার্য।

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে কয়েকটি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কটুবাক্য পরলেও প্রকাশ্যে তা বলার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। কারণ প্রকাশ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার ফল যে মোটেই ভালো হবে না—একথা তিনি ভালো করে জানতেন। তাই মেরী হেলকে একটি চিঠিতে (৩০ অক্টোবর, ১৮৯৯) ব্রিটিশ শাসনকে প্রশংসামূলক, সম্মানসম্মত, দুর্ভিক্ষের জন্মদাতা, পরাধীনতা সৃষ্টিকারী ও ব্রাহ্মণতন্ত্র দ্বারা অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের মধ্যে। দরিদ্র ‘নারায়ণ’ হিসেবে বিবেচিত নারী-মবদা বিনষ্টকারী বলে চিত্রিত করলেও এ চিঠিকে গোপন রাখতে বলেছেন কারণ তা না করলে ব্রিটিশ সরকার বিনা বিচারে তাঁকে হত্যা করবে বলে তাঁর

শঙ্কা। (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ৬৬৪)। অর্থাৎ ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র্য-পানান্নার মূল কারণটি তাঁর কাছে অজানা নয়। তবুও সেই মূল কারণ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোনও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়নি। বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে ব্রিটিশ শাসকের অপসারণ তাঁর কাছে অসম্ভব বলে মনে হত এবং হয়তো সেই কারণেই এই শাসনের বিরোধিতা না করে বারবার প্রশংসমান হয়েছেন। আর ভারতীয় জনগণের মুক্তির বিকল্প পথ হিসেবে আধ্যাত্মিকতার পথকে গ্রহণ করেছেন। এই পথকে আকর্ষণীয়, গ্রহণযোগ্য ও বৈধ করার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন জনসেবামূলক প্রকল্পকে। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া উপদেশের মধ্যে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান মেলে : “... তুমি যদি পরার্থে সেবাকল্পে দীন দুঃখীকে... দু মূঠো অন্ন দিতে পারিস, তাহলে জীবজগৎ তোমার মঙ্গল তো হবেই—সঙ্গে সঙ্গে তুমি এই সংস্কারের জন্য সকলের sympathy (সহানুভূতি) পাবি। এই সংস্কারের জন্য তোকে বিশ্বাস করে আমকাঙ্ক্ষনবদ্ধ সংসারী জীব তোমার সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। তুমি বিদ্যাদানে বা গানদানে যত লোক আকর্ষণ করতে পারবি, তার সহযোগ লোক তোমার এই প্রযোচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। এই কার্যে তুমি public sympathy (জনসাধারণের সহানুভূতি) যত পাবি, তত আর কোনও কার্যে পাবিনি। এই রূপে লোক আকৃষ্ট হলে তখন তাদের মধ্যে দিয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পারবি।” (চক্রবর্তী। ২০১২:১৩৬-৩৭)। বিবেকানন্দের কাছে এই বিদ্যা ও জ্ঞান হল আধ্যাত্মিক বিদ্যা ও জ্ঞান। কারণ ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞানই হল প্রকৃত জ্ঞান, আর সব বাজে। (শ্রীম। ১৩৭৭ বাংলা : ২ : ২৫২)।

দরিদ্রের দুঃখ নিবারণে বিবেকানন্দের সেবা প্রকল্পটিও এইভাবে গৌণ বিষয়ে পরিণত হল।

তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞান প্রচার। আবার দরিদ্র-নারায়ণের সেবা প্রকল্পটি হয়ে পড়ল দু-দুটি পরস্পর বিরোধী অবস্থানের মধ্যে। সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রচেষ্টা। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ দ্বারা নিম্নবর্ণ এবং ব্রাহ্মণতন্ত্র দ্বারা অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের মধ্যে। দরিদ্র ‘নারায়ণ’ হিসেবে বিবেচিত হলে ঠিকই—কিন্তু তাতে তাদের দরিদ্রতা ও ঘুচল না আবার বর্ণগত অবমাননাকর ব্যবহারও পরিবর্তন ঘটল না। ‘শিবজ্ঞানে জীব সেবা’ পরিণত হল ধর্মপ্রচারের

প্রাগম্যাটিজম তাঁকে এটা বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, অবিমিশ্র ধর্ম কথা নির আধ্যাত্মবাদ মানুষকে খুব একটা আকর্ষণ করতে পারবে না। তাই মানুষকে বিশেষ করে নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্ণকে কাছে টানতে প্রয়োজন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে তিনি সফল হলেও, অন্যদিক থেকে তাঁর সাথে বিদ্যাসাগরে অবিমিশ্র মানব প্রেমের থেকে পাকাপাকিভাবে বিচ্ছেদ তৈরি হয়। বিদ্যাসাগরে গোটা জীবন থেকে যা উঠে আসে তা হল পুরুষার। আর ঈশ্বরের মহত্ত্ব করুণার চরম অধীকৃতি। এবং মানুষকে শ্রেষ্ঠ আসন দান। বিবেকানন্দের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁর গুরুত্ব প্রভাব তাঁকে নিখাদ মানবপ্রেমিক করে তুলতে পারেনি।

(২)

কোন কোন সরকারি মার্কসবাদী যান্ত্রিকভাবে বিবেকানন্দের সাথে মার্কসের সাদৃশ্য খুঁজে বের করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান। অতি উৎসাহী হয়ে মার্কসবাদ ও বিবেকানন্দ চিন্তার মধ্যে কথোপকথন চালানোর পরামর্শ দেন। বিবেকানন্দের ‘দরিদ্রনারায়ণ’ সম্পর্কিত ধারণাটির একটি পরিণতি হল শূদ্র জাগরণের তত্ত্ব “মার্কসবাদী” বিবেকানন্দের এই শূদ্রজাগরণের তত্ত্বের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। তাঁদের মতে, বিবেকানন্দের এই শূদ্র শাসনের ধারণা আসলে সর্বহারা শাসনের ধারণা। (নাথুদিরিপাদ। ২০১২ : ১৬)। আর এক “মার্কসবাদীর” মতে, এই শূদ্র শাসনের ধারণার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ এক শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। (সে, অমলেন্দু। ২০১২ : ৫৪)

এইসব মার্কসবাদীদের সমস্যা হল এঁরা যান্ত্রিকভাবে বিবেকানন্দকে চর্চা করেছেন। নিজের মনোমত পছন্দমত উক্তি ব্যবহার করে বিবেকানন্দকে ব্যাখ্যা করেছেন। বোজার চেষ্টা করেননি তাঁর চিন্তার প্রধান বৌদ্ধিক কোনটি। এটা অনেকটা প্রোক্রাসটিস্-এর গল্পের মতন। গ্রীক দেশে প্রোক্রাসটিস নামে এক অসহুত লোক থাকত। সে বনের ধারে ওৎ পেতে বসে থাকত একটা খাটের ফ্রেম নিয়ে। কোনও পথচারীকে পেলে সে তাকে ধরে সেই খাটের ফ্রেমের উপর ফেলে দিত। পথচারীর চেহারা যদি খাটের সেই ফ্রেমের থেকে বড় হত তাহলে দেহের বাড়তি অংশটিকে কেটে ফেলে দিত। আর কম হলে তাকে টেনে বড় করত, যাতে করে

খাটের মাপের হয়। বলা বাহুল্য যে উভয় ক্ষেত্রেই পথচারীর পরিণতি হত শোচনীয়। বিবেকানন্দ চর্চাকারী মার্কসবাদীদের সমস্যাটা এই রকমই। যেখানে যেখানে বিবেকানন্দ ভাবনার সাথে মার্কসবাদের সামান্য সাদৃশ্য রয়েছে সেই খণ্ডটুকুকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন আকৃতি এঁদের দান করেন—যার মধ্যে সত্য কোনওভাবেই প্রতিফলিত হয় না। এইসব ‘মার্কসবাদীদের’ হাতে পড়ে বিবেকানন্দের ‘শূদ্র শাসন’ ভাষান্তরিত হয়ে ‘সর্বহারা শাসনে’ পরিণত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে প্রান্তিক কিছু সাদৃশ্য থাকলেও, মূল প্রশ্নে রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

প্রথমেই যে বিষয়টি স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার তাহল—‘শূদ্র’ শব্দটিকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় এবং বিবেকানন্দ কি অর্থে ব্যবহার করেছেন। বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে ‘শূদ্র’ সংক্রান্ত আলোচনায় ‘শূদ্র’-কে কখনও শ্রেণী, কখনও জাতি, কখনও বর্ণ, আবার কখনও কতগুলি বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি শূদ্রকে social class বা সামাজিক শ্রেণী (যাঁরা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশ নিয়ে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন এবং উৎপাদনের ভাগ নেয়) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেননি। ‘শূদ্র’ শব্দটি তাঁর কাছে প্রধানত দুটি অর্থে এসেছে—(ক) বর্ণব্যবহার সর্বনিম্ন স্তর, এবং (খ) দরিদ্র মানুষ।

তাঁদের দারিদ্র্য, অসহায়তা, যন্ত্রণাকর জীবনের কথা, সম্পত্তিহীন ও উচ্চবর্ণের অত্যাচারের কথা ও বর্ণনা স্থান পেয়েছে বিবেকানন্দের রচনায়। ভাষাতাত্ত্বিকতাই জন্ম দিয়েছে এসবের। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সমাজ দার্শনিকের বিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত।

শূদ্র জাগরণ সম্পর্কে বিবেকানন্দ সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন ‘বর্তমান ভারত’-এ। এখানে তিনি শূদ্র জাগরণ সংক্রান্ত ধারণাটিকে যৌক্তিক করতে ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। এ ইতিহাস মিথ নির্ভর। তাঁর ব্যাখ্যার ভিত্তি হল পুরাণ ও মহাকাব্য। এগুলির মধ্যে ইতিহাসের উপাদান থাকলেও এগুলি ইতিহাস নয়। ফলে তাঁর ধারণাটি হয়ে পড়েছে অসংবদ্ধ, অস্বচ্ছ ও অনৈতিহাসিক। তাঁর ভাবনাটি ছিল অবিমিশ্র হিন্দু ধারণা। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী : “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে।” (বিবেকানন্দ। ২০১২ : ৬ : ১৮০)। চারি বর্ণের আবির্ভাবের কারণ কি? গীতা অনুসরণ করে তিনি

দেখিয়েছেন : “সম্ভ্রাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য সমাজে বিদ্যমান আছে।” (পূর্বোক্ত : ১৭৮)। অন্যত্র তিনি এ ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আদিতে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল। তারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। (পূর্বোক্ত : ৫ : ১৪৬)।

বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবাসীকেই শূদ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (পূর্বোক্ত : ৬ : ১৮৭)। এই শূদ্রেরা হল ‘চলমান স্বাশান’ ও ‘ভারবাহী পশু’। “এদের চেষ্টার তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দানত্বে অক্লিষ্ট নাই, হৃদয়ে শ্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই, আছে প্রবল ইর্ষা, স্বজাতিদেষ, আছে দুর্বলের যেনতেন প্রকারেণ’ সর্বনাশ সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে।” (পূর্বোক্ত)। তাঁর মতে শূদ্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে ঠিকই কিন্তু তা হবে ‘শূদ্রত্ব সহিত’। (পূর্বোক্ত : ১৮৮)। ফলে তাদের শাসন যে সুশাসন হবে না তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ যারা সেখান বিবেকানন্দের শূদ্র জাগরণ ও শাসনের ধারণা আসলে শ্রমিক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ বিজয় ঘোষণার বার্তা—তা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ শূদ্রের সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকাটি বিবেকানন্দের কাছে একেবারেই নেতিবাচক। ব্রাহ্মণ্যাত্মিক মতাদর্শকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই প্রশ্নেই উঠে আসে সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গটি। মার্কসবাদী দর্শন অনুযায়ী—এ যুগের সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী। এই শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র মানে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌছানোর পথে একটি উত্তরণকালীন অবস্থা। এই পর্বে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ধীরে ধীরে চলে যাবে গোটা সমাজের হাতে। রাষ্ট্র ক্ষয়ে যেতে শুরু করবে; সাবেকী শোষক শ্রেণীগুলির অবসান ঘটতে থাকবে; ব্যক্তি মালিকানার মূলোচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে। বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর সমাজতন্ত্রের যে ধারণা পাওয়া যায় তা অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট। তবুও তার মধ্যে থেকে যা বেরিয়ে আসে তা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সাথে একেবারেই মেলে না। মেরী হেলকে তিনি

লিখেছিলেন, “আমি... একজন সমাজতন্ত্রী।” (১ নভেম্বর, ১৮৯৬। বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ৫০১)। কেন তিনি সমাজতন্ত্রী কারণ এই ব্যবস্থায় শূদ্ররা কিছুটা আরাম পাবে। তাঁর সমাজতন্ত্র হল শূদ্র শাসন বা যুগ। “শূদ্র যুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।” (পূর্বোক্ত)। শূদ্র যুগ অপ্রতিরোধ্য হলেও তিনি কি তার পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন? নিঃসন্দেহে না। তিনি ওই চিঠিতে দেখিয়েছেন, এই যুগে সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে এবং সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে। (পূর্বোক্ত : ৫০৮)। সুতরাং শূদ্র শাসনকে আদৌ গ্রহণ করা যাবে কিনা—তা নিয়েই তাঁর মনে সংশয় ছিল।

এই কারণেই বোধ হয় তিনি আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনা করেছেন। ওই চিঠিতেই তা প্রকাশিত হয়েছিল : “যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, তাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। (পূর্বোক্ত : ৫০৯)। অর্থাৎ তাঁর ভাবনা অনুযায়ী শূদ্র শাসন হল এক ধরনের সমাজতন্ত্র। যার আগমন হবেই। কিন্তু তা ক্রটিপূর্ণ তাই আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে হবে চারি বর্ণের সমাহারে। কিন্তু তাঁর ভাবনা সম্পর্কে অন্য কেউ নয় তিনি স্বয়ং সন্দিহান ছিলেন। অস্থির চিন্তা তাকে এইভাবে এক সিদ্ধান্ত থেকে অন্য সিদ্ধান্তে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে তিনি ‘সমাজতন্ত্র’ শব্দটির অপব্যবহার করেছিলেন। এবং সেটা হয়তো না বুকেই। কারণ ১৮৯৩-এ ব্যবহৃত ‘সমাজতন্ত্র’ শব্দটি তিনি আবার ভিন্ন অর্থে—১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ব্যবহার করেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনায় শেফার্ডীয়র ক্লাবের একটি সভায় ‘ভারতের নারী’ শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন, “কোনও এক বর্ণে জন্ম বলিয়া সেই বর্ণের ধর্মানুযায়ী আমাকে সমস্ত জীবন যাবন করিতেই হইবে। অর্থাৎ আপনাদের দেশের আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পাশ্চাত্য মানব আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক, আর হিন্দু সমাজতান্ত্রিক, পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক।” (বিবেকানন্দ। ২০১২ : ৫ : ৩৩৯)। এই বক্তৃতাতে তিনি আরও পাঁচবার সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন হল ‘হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক’ এ দাবি শুধু অভিনব তাই নয়, বিষয়করও বটে। হিন্দু সমাজের সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি হল বর্ণ-জাতিভেদ ব্যবস্থা। এই ক্রমোচ্চ

স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থাটি সাম্য ও স্বাধীনতার চরম অস্বীকৃতি। হিন্দু ধর্মের পালনীয় আচারগুলির মধ্যে রয়েছে চরম বৈষম্য। ব্রাহ্মণের যা অধিকার শূদ্রের তা একেবারেই নেই। শূদ্রের কাজ হল প্রথম তিন বর্ণের সেবা করা। এখানে ব্যক্তিগত সম্পদের বিলোপের কথা বলা হয় না। তাহলে কোন অর্থে হিন্দুরা সমাজতান্ত্রিক। ব্যক্তির তুলনায় সমাজ গুরুত্বপূর্ণ—এই অর্থে তিনি যদি হিন্দু সমাজকে সমাজতান্ত্রিক বলেন, তাহলে সকল উপজাতীয় কৌম সমাজগুলিকেই সমাজতান্ত্রিক বলতে হয়। বস্তুতপক্ষে ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দটির মধ্যে যে র‍্যাডিক্যালিজম ছিল তাকেই তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শব্দটি ছিল বিপজ্জনক তাই সেই শব্দটিকে তরলিকৃত করতেই হতাতত সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেন।

(৩)

দরিদ্র ও নিম্নবর্ণভুক্ত মানুষদের সম্পর্কে বিবেকানন্দ অনেক আবেগময় কথা বললেও শেষ পর্যন্ত তাঁর অবস্থানটি ছিল বিপরীত। ২৪ জানুয়ারি, ১৮৯৪-এ মাদ্রাজী ভক্তদের কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন, “মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে।” (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ১০৩)। কিন্তু দরিদ্রদের উপর তাঁর কোনও ভরসাই ছিল না। বরং তিনি অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন সম্পত্তিবানদের সাম্রিক্য পেতে। কারণ তিনি মনে করতেন সম্পত্তিবানদের সাহায্য ছাড়া ভালো কাজ হবে না। সম্পত্তিবানদের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তাঁর এই বড়লোক ঘেঁষা আচরণ দেখে অনেকেই বিরক্ত হতেন এবং জিজ্ঞাসাও করে ফেলতেন যে, সর্বভাষী সন্ন্যাসীর এ ধরনের আচরণের অর্থ কি? বিবেকানন্দ এ প্রশ্নের উত্তরে হরিপদ মিত্রকে বলেন, “হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়ে সংস্কার করতে পারলে যে ফল হবে, একজন শ্রীমান রাজাকে সেই দিকে আনতে পারলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হবে ভাব দেখি! গরিব প্রজার ইচ্ছা হলেও সংস্কার করার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব থেকেই রয়েছে, কেবল তা করার ইচ্ছা নেই। সেই ইচ্ছা যদি কোনওরূপে তার ভিতর একবার জাগিয়ে দিতে পারি, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে

তার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরে যাবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হবে।” (মিত্র, হরিপদ। ২০১২ : ৭৯)।

সুতরাং রাজা মহারাজাদের সাথে মিশতে হবে। আর সেই লক্ষ্যেই তিনি একের পর এক রাজা, মহারাজা, নবাব, আমলা, বণিক, ধনী ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। শিষ্য ও অনুরাগীদের পরামর্শ দিয়েছেন বড়লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য। আলানিস্কাকে লিখেছেন, “একখানা [বিবেকানন্দের ফটো] রামনাদের রাজাকে উপহার দিও—তাঁর ভেতর যতটা ভাব ঢোকাতে পারো, চেষ্টা কর। খেতড়ির রাজার সঙ্গে সর্বদা পত্রব্যবহার রাখবে।” (১১ জুলাই, ১৮৯৪। পত্রাবলী। ১৯৭৭ : ১৬৯)। অন্য একটি চিঠিতে লিখেছেন, “খেতড়ির রাজা ও কাঠিয়াওয়াড়স্থ লিমস্তির ঠাকুর সাহেব—যাহাতে আমার কার্যের বিষয় সর্বদা সংবাদ পান, তাহা করিবে।” (২৯ সেপ্টেম্বর। পত্রাবলী। ১৯৭৭ : ২০১)। আলানিস্কাকে অপর একটি চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছেন, “মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা ও আর কয়েকজনকে এই কাজের [হিন্দু ধর্মের পুনরীক্ষণ] প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করবার চেষ্টা কর।” (পত্রাবলী। ১৯৭৭ : ২৪৫)। আলানিস্কাকে তিনি বড়লোকদের নেতা করার উপদেশও দিয়েছেন। “... কোন বড়লোককে তোমাদের নেতা কর।” (পূর্বোক্ত : ৩৩৫)।

এই সম্পত্তিবান শ্রেণী বিশেষ করে রাজা মহারাজেরা যে বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করেন তার ভিত্তি হল দরিদ্র মানুষের উপর নির্মম শোষণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাই এই পরজীবী শ্রেণীর জন্মদাতা। এদের উপাস্য দেবতার নাম অর্থ। আনুগত্য কেবল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি, দায়বদ্ধতা কেবল বিলাসীতায়। আর তাদের সংস্কৃতি হল ধর্মীয় অন্ধত্ব। বিবেকানন্দ ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণম্যাটিক। তাই তিনি বুঝেছিলেন যে দরিদ্র মানুষকে দলে টানতে হবে ঠিকই কিন্তু তাদের উপর নির্ভর করা যাবে না। কারণ তা করলে তাঁর উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হবে না। তাই প্রয়োজন ‘শ্রীমান রাজাদের’ যাদের অর্থ আছে, যোগাযোগ আছে, প্রভাব আছে ইত্যাদি। বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যটি কি ছিল? শিক্ষা বিস্তার, ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যমোচন, ভারতের স্বাধীনতা লাভ? না এর কোনোটিই নয়। রাজা-জমিদারদের সাথে মেলামেশার পিছনে ছিল অর্থ সংগ্রহ করা। তাই তিনি ছুটে বেরিয়েছেন দেশীয় রাজাদের রাজ্যগুলিতে। তাঁর লক্ষ ছিল আমেরিকা যাবার

পাথের সংগ্রহ করার। এই পাথের একমাত্র রাজাদের কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তিনি আলাসিন্ধাকে একটি চিঠিতে (২১.২.১৮৯৩) লিখেছেন যে, তাঁকে মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ তার পরিকল্পনা ছিল, “আমেরিকা পাঠাবার জন্য আর্থবর্ডের কোনও রাজাকে ধরবার।” (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ৫৭)। যদিও পরবর্তীকালে তিনি তাঁর এই ‘রাজা ধরার’ কার্যক্রমকে অস্বীকার করেছিলেন। রাজা মহারাজা ও আমলাদের অর্থেই তিনি আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন। তাদের কাছ থেকে অর্থ, জামাকাপড়—সবই নিয়েছিলেন। অথচ অবলীলাক্রমে তিনি তা অস্বীকার করেছেন। ১৯৮৪, ২০ জুন-এ হরিদাস বিহারী দাশ দেশাইকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, “আমি সমস্ত অর্থ মরিচগুণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, ধনী-সম্প্রদায়ের দান আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই।” (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ১৪৫)। এটাকে সাদা বাংলায় বলা যায় সত্যের অপলাপ।

আমেরিকা ভ্রমণের প্রয়োজনের পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা, ভালো থাকা ও খাওয়ার প্রয়োজনটাও তাঁর কাছে কম জরুরি ছিল না। অতএব রাজা ধরায় তাকে নেমে পড়তেই হল। বিবেকানন্দের জীবনীকার সহ, ভক্ত ও অনুরাগীগণ যে প্রচার করেন তার পরিব্রাজন কালে ‘অন্ন ও আশ্রয়ের ঠিক ছিল না’—তা যে ঠিক নয় তা প্রমাণ হয় তাঁর আশ্রয়দাতাদের তালিকা দেখে। বিশেষ করে ১৮৯১-এর জুন থেকে ১৮৯৩-এর মে মাস অবধি তাঁকে ভালো থাকা খাওয়ার ব্যাপারে কোনও চিন্তাই করতে হয়নি। প্রমথনাথ বসু (২০১১), গভীরানন্দ EWD (1997) প্রমুখের রচনা থেকে আশ্রয়দাতাকে যে নামগুলি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রধানদের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল—

- ১। আলোয়ার মহারাজার দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী।
- ২। আলোয়ারের মহারাজা।
- ৩। খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল।
- ৪। খেতড়ির মহারাজ অজিত সিং।
- ৫। সাব জজ মি. দালশঙ্কর উমীয়াশঙ্কর।
- ৬। লিমডীর রাজা।
- ৭। জুনাগরের রাজা দেওয়ান হরিদাস বিহারী দাস।

- ৮। ভুজরাজের দেওয়ান।
- ৯। ভুজরাজের মহারাজ।
- ১০। পোরবন্দরের রাজা।
- ১১। পোরবন্দর রাজসভার পণ্ডিত শঙ্কর পান্ডুরং।
- ১২। বরোদার গায়কবাড়ের দেওয়ান বাহাদুর মনিভাই।
- ১৩। উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।
- ১৪। জজ মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ১৫। রামদাস ছবিল দাস।
- ১৬। সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র।
- ১৭। মহীশূর রাজার দেওয়ান স্যার কে. শেবাশ্রি আয়ার।
- ১৮। মহীশূর রাজা শ্রীচামরাজেন্দ্র উদীয়ার।
- ১৯। ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের স্নাতৃপুত্রের শিক্ষক সুন্দররমন আয়ার ও অধ্যাপক রঙ্গচরিয়া।
- ২০। রাজকুমার মাস্তুর্ত বর্মা।
- ২১। মাদ্রাজের সহকারী অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল মন্থনাথ ভট্টাচার্য।
- ২২। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভা উপলক্ষে আমেরিকায় গিয়েও সম্প্রদায়বাদের সাথেই যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হলেও পরবর্তীকালে (১৮৯৪) তিনি আমেরিকার উচ্চবিত্তদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি সহজেই “বড় বড় লোকের অতিথি” (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ১৬০) হতে পারতেন। সার বোঝা তিনি বুঝেছিলেন। তা হল ধনিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। শিকাগো যাত্রার টাকা যেমন তিনি বড়লোকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তেমনি ধর্মপ্রচারের জন্য, মঠ স্থাপনের জন্য এই বড়লোকদেরই যে প্রয়োজন—তা নিয়ে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। আমেরিকায় বেদান্ত ও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার পিছনে তাঁর টাকা সংগ্রহই ছিল মূল লক্ষ্য। গুরু ভাইদেরও একই পথে হাঁটাতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন, “সকল বড়লোকের কাছে যাতায়াত করিবে।” (বিবেকানন্দ। ১৯৭৭ : ২০৫)।

বিবেকানন্দের শ্রেণী অবস্থানটি কি ছিল সে সম্পর্কে যে ন্যতিক্রম সমীক্ষাটি এখানে উপস্থিত করা হল সেখান থেকে যা নিঃসৃত হয় তা জটিল গোলোক-ধারারই জন্ম দেয়। তবুও এরমধ্যে থেকে যে প্রধান বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয় তা আর যাই হোক শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সপক্ষে যায় না। বরং সম্পত্তিবান শ্রেণীর পক্ষেই সহায়তা করে। বৈষ্ণব বংশ বা সাময়িক ক্ষোভ থেকে সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে কোনও কোনও সময় কটু কথা বললেও, অধিকাংশ সময়ই ধনী-দরিদ্রের সমন্বয়ে কল রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকেই তিনি লালন করেছেন মনের মধ্যে। তাঁর এই আজগুবি ভাবনার পিছনে, প্রগতিবিরোধী ভাবনার পিছনে যে দর্শন কাজ করেছে তা হলো বেদান্ত দর্শন। এই বেদান্ত দর্শন হল একটি চরম ক্ষতিকর ও প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন। এই দর্শন শূন্য দমনের গোঁড়া সমর্থক। বেদান্তবাদীরা বর্ণভেদের দর্শন প্রচারের পাশাপাশি শূদ্রের সকল ধরনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। এই দর্শন অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা কৃষি কাজ সহ কোনও ধরনের শ্রম ও উৎপাদনমূলক কাজ করবে না। এ কাজ শূদ্রের। বৃহদারন্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম উন্নততর মানুষ হিসেবে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে চন্দ্রালকে কুকুর ও শূকরের সমাগোষ্ঠীয় বলা হয়েছে। শঙ্করের কাছে জগৎ মিথ্যা হলেও, জাতিপ্রথা মিথ্যা নয়। (ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। ২০০০ : ৮৯)। এ দর্শন হল প্রভুশ্রেণীর দর্শন, উচ্চবর্ণের দর্শন, শ্রমদানকারী শূদ্রের নয়। পরগাছাদের দর্শন। বিদ্যাসাগর এই কারণেই এই দর্শনকে আস্ত্র দর্শন বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

বিবেকানন্দ কিন্তু এই দর্শনেরই জয়গান গেয়েছেন। ভারতবর্ষের শুধু নয়, গোটা পৃথিবীর ভবিষ্যতের ধর্ম হিসেবে বেদান্তকেই চিহ্নিত করেছেন। শূন্য জাগরণের তত্ত্ব, সমাজতন্ত্রী হিসেবে নিজেকে দাবি করা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা ইত্যাদি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে কথার কথায়। বাস্তবে তা রূপ পেয়েছে প্রভু শ্রেণীর সেবায়। কারণ তাঁর নিজের জীবনও ছিল প্রভুদের দ্বারা নির্মিত প্রভু শ্রেণীর জন্যে পরিচালিত এবং প্রভুদের স্বার্থে নিয়োজিত।

গ্রন্থপঞ্জি :

- গঙ্গীরানন্দ, স্বামী। ২০১২। যুগানায়ক বিবেকানন্দ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। তিন খণ্ডে সমাপ্ত।
- চক্রবর্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র। ২০১২। স্বামী-শিষ্য-সংবাদ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়।
- দত্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ। ১৪০০ বাংলা। স্বামী বিবেকানন্দ। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স।
- সে, অমলেন্দু। ২০১২। প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ : মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে। কলকাতা : এন.বি.এ।
- নাথুদিগিপাদ, ই.এম.এস। ২০১২। প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ : মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে। কলকাতা : এন.বি.এ।
- বসু, প্রমথনাথ। ২০১১। স্বামী বিবেকানন্দ। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ।
- বিবেকানন্দ, স্বামী। ১৯৭৭। পত্রাবলী। কলিকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়।
- বিবেকানন্দ, স্বামী। ১৯৭৭। বাণী ও রচনা। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়। দশখণ্ডে সম্পূর্ণ।
- ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। ২০০০। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস। কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স।
- শ্রীম-কথিত। ১৩৬৬ বাংলা। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত। প্রথমভাগ-১৩৬৬, দ্বিতীয় ভাগ - ১৩৭৭ বাংলা।
- EWD (His Eastern and Western Disciples). 1997. *The Life of Swami Vivekananda*. Calcutta. Advaita Ashrama.

‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাত’ - কেমন আছেন দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও মহিলারা?

পলাশ রায়

রাঘবের রাজসভা জমে ওঠে, শুধু মাঝে মাঝে
গলিত মাংসের গন্ধে মরে যায় চন্দন সুবাস—
যমুনার শীর্ণ হতে কোথা হতে এসেছে ভাসিয়া
রাজ্যের মানের ঘাটে ছিল শির চন্ডালের লাশ।

(সৌজন্যে : সরোজ দত্ত - উত্তর কান্ত)

সংবাদ মাধ্যমের প্রচারের বড়ে ‘ভাইব্র্যান্ট গুজরাতের’ কম্পানে সারাটা দেশ একেবারে থরহরি কম্পমান। কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারের বিপ্রতীপে যদিও কিছু বিকল্প প্রচার মাধ্যম (লিটল ম্যাগাজিন, নানা রকম গণ-আন্দোলনের দ্বারা পরিচালিত ওয়েবসাইট, তথ্যচিত্র, নাগরিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রিপোর্ট) প্রকৃত যে চিত্রটা তুলে ধরছেন, তা ভয়াবহ। যেমন তারা বলেছেন দারিদ্র্য দূরীকরণে মোদির গুজরাত সবচেয়ে পিছিয়ে। বিগত বারো বছরে সেখানে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে ৩৯.০৬ শতাংশ। বেকার সমস্যায় সারা দেশের মধ্যে গুজরাতের স্থান সপ্তমে। শিশুমৃত্যুতে দশমে। ওই রাজ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ সদ্যজাত শিশুর গড় ওজন স্বাভাবিকের থেকে কম। শতকরা ৭৫ জন ৫ বছর বয়সী শিশু রক্তাশ্রিত শিকার। গুজরাতের ২৮ জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে ৫৭টি আজও বিদ্যুৎহীন। প্রায় পৌনে ২ কোটি মানুষ আজও বিশুদ্ধ পানীয় জলটুকুর থেকেও বঞ্চিত। এটা যদি হয় উন্নয়নের সাধারণ চিত্র তাহলে সেখানে কেমন আছেন দলিত, সংখ্যালঘু বা আদিবাসী মানুষরা। হনুপ্রেমী-মনুবাদী হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের রাজত্বে কেমনই বা আছেন নারীরা? কীতুহল বশত খোঁজ খবর নেওয়া গেল। খোঁজ নিতে গিয়ে এ যে দেখি কেঁচো খুঁড়তে কেউটে উঠে আসার দশা।

প্রথমেই শিক্ষার চিত্রটার দিকে নজর গেল। এমনিতেই ড্রপ আউটের সংখ্যা গুজরাতে ক্রমবর্ধমান, তাই আবার দেখা গেল ড্রপ আউট ছাত্রদের অধিকাংশই হয় আদিবাসী, নয় দলিত। বিভিন্ন অধিকার সংগঠনের রিপোর্ট অনুযায়ী এর কারণ হচ্ছে দারিদ্র্যের পাশাপাশি চূড়ান্ত বৈষম্য। দলিত কিংবা আদিবাসী ছাত্রদের দিয়ে সাধারণত বিদ্যালয়ের বারান্দা, শ্রেণি কক্ষ, শৌচাগার পরিষ্কারের মতো কাজও করিয়ে থাকে উচ্চবর্ণের শিক্ষক ও সহপাঠি ছাত্ররা, যা প্রান্তিক সমাজ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি অনীহাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। লিঙ্গ বৈষম্যেও গুজরাতের অবস্থা বেশ কঙ্কণ। সারা দেশের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যে গুজরাত প্রথম। অর্থাৎ সরল কথায় বললে সারা দেশের মধ্যে গুজরাতেই সব থেকে কম মেয়ে লেখা পড়া শিখতে স্কুলে যায়। এই তো চাই! এই না হলে মনুবাদীদের ‘ব্রাহ্ম এম্বাসেডর’! শুধু তাই নয় প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৩২.৩ জনের ওজন স্বাভাবিক গড় ওজনের থেকে কম। মোদির নির্লজ্জ সাফাই, মেয়েরা নাকি সে রাজ্যে ডায়েট কন্ট্রোল করছেন, তাই নাকি তাদের ওজন কমছে! যৌন নির্যাতন নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই, কারণ সারা দেশ জানে গুজরাতে ২০০২ সালের গণহত্যার সময় সংঘ পরিবারের বীরপুস্কবদের দ্বারা যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন অগণিত মহিলা। সম্ভ্রান্তসম্ভবা নারীর পেট তলোয়ার দিয়ে চিরে বার করে আনা হয়েছিল গর্ভের ভ্রূণ। দোষীদের কারও শাস্তি হয়নি মোদি সরকারের সৌজন্যে। মোদির বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যক্তিগত চর্চা না হয় না-ই করলাম, ইশরাত জাহান মামলা নিয়েও না হয় অনেক কথা এখনও অবধি হয়েছে। কিন্তু একজন মহিলার পিছনে পুলিশ দিয়ে নজরদারী চালানোর ঘটনটাকে কি বলা যাবে? এ থেকে কি এটা প্রমাণ হয় না যে, মোদির রাজত্বে মহিলারা আদৌ নিরাপদ নয়।

কেমন আছেন আদিবাসীরা? এ কথা বলার আগে সর্বপ্রথম যেটা বলে নেওয়া দরকার তা হলো, আজ বিশ্বায়নের এই তথাকথিত উন্নয়নের যুগে দেশের সম্পদ যে নির্বিচারে কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আদিবাসী জনগণ, কারণ বড় নদী বাঁধ নির্মাণের নামে, পারমাণবিক চুল্লি বা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নামে, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ কেন্দ্র গড়ে তোলার নামে বা শিল্প তালুক গড়ে তোলার নামে—সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদ করা হচ্ছে আদিবাসী

জনতাকেই। পরিসংখ্যান বলছে এ ব্যাপারে মোদি রেকর্ড করেছেন। টাটার ন্যাকারখানার জন্য মোদি জমি দিয়েছে বর্গ কিলোমিটার প্রতি ৯৮০ টাকা যেখানে জমির দাম ছিল বর্গ কিলোমিটার পিছু ১০ হাজার টাকা। মৃত্যুর প্রকল্পের জন্য আদানি গোষ্ঠীকে এবং এল এন্ড টি কে জমি দেওয়া হয়েছে বর্গমিটার পিছু ১ টাকা দরে। একইভাবে এসার গোষ্ঠীকে লৌহ শিল্পের বনভূমি সংক্রান্ত সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিরাট পরিমাণ জমি দিয়েছে গুজরাতের মোদি সরকার। উদাহরণের তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। এ ছাড়াও একটি সরকারের জমানায় আদিবাসীরা যে উচ্ছেদ হবেন এটা ভাবতে একটা কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। ঘটনা হচ্ছে আদিবাসী জনতা গুজরাতে বাধ্য হচ্ছেন বাস্তবিকিটে ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে। সংখ্যাটা কিন্তু বিরাট। গুজরাতে বসবাসকারী আদিবাসীদের মোট ৪৭.৯০ শতাংশ। এছাড়াও গুজরাত হচ্ছে এমন একটা রাজ্য যেখানে মাত্র এক-চতুর্থাংশ আদিবাসী দু’বেলা পেট পূরণ খাবার পায়, বাকিরা দু’বেলা পেট ভরে খাবারই পান না।

মোদি নিজের ওবিসি পরিচয়কে ভেটিব্যাঙ্ক মজবুত করার স্বার্থে কাজে লাগান। প্রায়শই তিনি বলেন যে তিনি নিজে নাকি অস্পৃশ্যতার শিকার হয়েছে বহুবার, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে মোদির প্রায় এক যুগের শাসনে গুজরাতে অস্পৃশ্যতা রয়ে গেছে ব্যাপক হারে। NOVARSJN নামে একটা বেসরকারি সংস্থা গুজরাতের ১৫৮৯টি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পায় যে মোটামুটি শতকরা ৯৮ শতাংশ গ্রামই অস্পৃশ্যতা কবলিত। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী গুজরাতে উচ্চশিক্ষায় দলিতরা রয়েছে মাত্র ৩.৯৮ শতাংশ। ৬৭.২ শতাংশ দলিত পরিবারের কোনও স্যানিটারি শৌচাগার নেই। এদের মধ্যে আবার ১৫.৯ শতাংশের কোনও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। সাধারণ ভাবে তারা মাঠেই শৌচকর্ম সেরে থাকে। গুজরাতে এট্রোসিটি এগেইনস্ট এসসি/এসটি এক্ট অনুযায়ী অভিব্যক্তদের মধ্যে মাত্র আড়াই শতাংশের সাজা হয়েছে যেখানে বেকসুর খালাস হয়েছেন সারে সাতানব্বই শতাংশ। যদিও গুজরাতের শহরগুলিতে দলিতরা যথেষ্ট পরিমাণে বাস করেন, তথাপি এখানে বৈষম্য চোখে পড়ার মতন। সাধারণভাবে কোনও বর্ণহিন্দু পরিবার দলিত পরিচয়ের নাগরিককে ঘর ভাড়া দিতে চায় না, এমনকি দলিত পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হলেও একই ধরনের সমস্যা

যা হয়। দলিত পরিবারগুলোকে বিল্ডার্স বা প্রমোটারদের থেকে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে নানা সমস্যায় পড়তে হয়।

মোদির রাজত্বে গুজরাতে মুসলিম জনগণ যে নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাবেন তা খার বজার অপেক্ষা রাখে না। কেননা গুজরাত পনহত্যার রক্তের দাগ এত স্পষ্ট যে মোছার নয়। ২ হাজারের বেশি সংখ্যালঘু মানুষকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল, যে গোটা দেশকে নির্বাক করে দিয়েছিল। আজও কিন্তু দোষীদের শাস্তি হয়নি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবদের জঙ্গী বলে হত্যাকারী পুলিশ ও খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী ও কর্তাদের। আমরা সবাই জানি এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট স্বয়ং মর্মেদিকে ‘আধুনিক নিরো’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। আজও কিন্তু সেই আতঙ্ক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মোদি জমানায় সরকারি দপ্তরগুলিতে এমনভাবেই তাদের সংখ্যা কমছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আগে যেখানে ৭০০০ পরিষেবা ক্ষেত্রে তারা কাজ করতেন শতকরা ৪১ শতাংশ হারে, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩১.৭ শতাংশ। জাতিপুঞ্জের রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিমদের মাথাপিছু দারিদ্র্যের হারের অনুপাতে গুজরাতের অবস্থান চতুর্থ। স্ব-রোজগার পরিকল্পনা ২০০৪-০৫ সালে মুসলিমদের অংশগ্রহণ ছিল ৫৯ শতাংশ, বর্তমানে তা নামে এসেছে ১৪ থেকে ১৭.৭ শতাংশ। শহরে বসবাসকারীদের মধ্যে বর্ণহিন্দুদের ৭১ শতাংশ মুসলিমদের দারিদ্র্যের হার ৮০০ গুণ বেশি। গ্রামে বসবাসকারীদের মধ্যে বর্ণহিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের দারিদ্র্যের হার ২০০ গুণ বেশি।

এই হচ্ছে এক ঝালকে ভাইব্রান্ট গুজরাত। একদিকে ঝাঁ চক্চকে উন্নয়নের প্রদর্শন। কর্পোরেট পুঞ্জির এই মুহুর্তের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঠিকানা। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের আদর্শ ‘রামরাজ্য’। যেখানে বালি, শমুক, একলব্যের জন্য কিংবা পূর্ণনখা, তারকা, হিরিমা অথবা সীতা, দ্রৌপদীদের জন্য রয়েছে অপমান, বঞ্চনা, বৈষম্য অঙ্গকার...

□

চোয়াড় বিদ্রোহ

সুনীল কুমার দাস

পৃথিবীর যে কোন জগোষ্ঠীর বা বিশেষ করে ভারতের মূল নিবাসী বা আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষের চৈতন্যের বিকাশ ঘটানোর জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের প্রয়োজন।

কেউ কেউ বলেন 'চোয়াড় বিদ্রোহ'-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি। কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক ভ্রান্ত ধারণা। সত্যিকারের ঐতিহাসিক ঘটনা হল যে, "চোয়াড় বিদ্রোহ"-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সরদার গোবর্ধন বাউড়ী এবং ধলভূমের সরদার জাথ ধূলা বাউড়ী, মানভূমের সরদার গোবিন্দ মানা বাউড়ী ও সিংভূমের সার লক্ষ্মণ দিগার বাউড়ী আরও অন্যান্য বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। ঐ রাঢ় দেশ অর্থাৎ বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝিঁম, রাঁচি, হাজারীবাগ, ছোটনাগপুর, দুমকা ও ভাগলপুরের আদিম ভূমিগুলি, বিশেষ করে আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের রাঢ় মাটির জনগণ হতে আত্মপরিচয় দিয়ে আসছেন, খ্রীঃ পূর্ব ৩২৭ অব্দ অর্থাৎ আলেকজান্ডার আমল হতে। সেই লড়াই আজও চলছে রাঢ় মাটির জন্য। মোঘল আমলে বাংলার নবাব আলীবর্দী খান-এর সময় এবং ব্রিটিশ যুগের প্রারম্ভে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ ৬৩ বছর ধরে চোয়াড় বা চোয়াড় বিদ্রোহ (বাউড়ী বিদ্রোহ) নামক রাঢ় অঞ্চলের আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা জমিদার, রাজা ও ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা লড়াই করেছিলেন। সমস্ত রাঢ়ের প্রাচীনকালে বাউড়ী ভূমি বা বাউড়ীদেশ ছিল। J.C.K. Peterson-এর Bengal District Gazetteers (Burdwan) গ্রন্থের W.B. Oldham-এর লেখায় জানা যায় যে, The whole of the modern district of Burdwan, Hughli and Bankura and great part of Midnapore, Birbhum, Manabhum and the Santhal Paraganas and contains the whole of the present Bouri Country. বাউড়ী দেশ-এ মেদিনীপুরের বাউড়ীদের প্রাচীন জমি কর্ণগড়-এর দেওয়ান অজিত সিং দখল করে নেন। বাউড়ীদের নিজস্ব জমি আবার দখল

সুনীল কুমার দাস

নেওয়ার জন্য ১৭৫৩ সালে বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা অজিত সিং-এর মৃত্যুর পর রানী শিরোমণির বিরুদ্ধে লড়াই করে কর্ণগড়-এর অঞ্চল দখল নেন। L.S.S.O malley-এর লেখা Bengal District Gazetteers Midnapore গ্রন্থ থেকে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য জানা যায়— While the Bolder Spirits Joined the bonds Chuars. In this connection the collector reported to the Board on 25th May 1799. "The resumption of the Paikan Lands had taken place in the years 1201 and 1204 (F. Style); ... Ajit Singh of Karnagarh, the descendant of the Diwan, died without issue 1753 A.D., and his two wives. Rani Bhawani and Rani Siromani, succeeded to the Midnapore Raj. At this time the Chuars were in the field, and the leader of the Chuars Gobordhan Sardar, Taking advantage, of the prevailing Disorder, advanced against the Ranis with a strong force. The Ranis to save themselves from dishonour, fled from Midnapore and found shelter with their relations, Trilochan Khan of Narajol. ঐ চোয়াড় বিদ্রোহ বা লড়াই ১৭৫৩ সাল থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত হয়েছিল। উপরোক্ত Gazetteers থেকে জানা যায় In February 1816, the Chuars Banditti Consisted of 19 leaders and about 200 accomplices. পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম জনগণের দ্বারা চোয়াড় বিদ্রোহ বা লড়াই, রাজা এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে। তারপর ১৭৮৯ সালে ফ্রান্স জনগণের দ্বারা ফরাসী বিপ্লব বা লড়াই হয়। J.C.K. Peterson-এর Bengal District Gazetteers Burdwan গ্রন্থে ১৮৮৯ সালে বর্ধমান জেলার Magistrate এবং নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক W.B. Oldham মহাশয়ের লেখা Appendix অংশে পাই— "The other great Stratum of the Population the Bauri Caste is to be found in the Western Portion of the District. But the Bauri's Though semi Hinduised and calling themselves Hindus and so-called by their low caste Neighbours, are not admitted to be Hindu by the hindu

Aryons but are Pronounced by them to be unmitigate Chuars.” এই চোয়াড় বা চোয়াড় বিদ্রোহ (বাউড়ী বিদ্রোহ) হল, পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সরকার এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই। এই বিদ্রোহ-এর জন্য বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষদের হাজার হাজার অমূল্য জীবন ব্রিটিশ শাসকদের বন্দুকের গুলিতে শেষ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ঐতিহাসিকগণ এই চোয়াড় বা চোয়াড় বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিস্তারিত বাউড়ী জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেনি। অথচ ‘ফরাসী বিপ্লব’ থেকে ‘চোয়াড় বিদ্রোহ’ বা বিপ্লব পৃথিবীর মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। কারণ ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা বলেন—ফ্রান্সের বিপ্লব মনস্কতা তৈরির ক্ষেত্রে ফরাসী দার্শনিকদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থনীতি ইত্যাদি জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অনায়াস অনাচার সক্রিয় ছিল, তার গ্রহণযোগ্যতা বা আবশ্যিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন সমকালীন ফরাসী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের অনেকেই। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল—ভলতেয়ার, মন্টেস্কু, রুশো, ডিওরো, এলেমবার্ট প্রমুখ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল কিংবা আশ্চর্য বিষয় হল যে, রাঢ় দেশে চোয়াড় বিদ্রোহ-এর সরদার বা নেতৃগণ এবং জনসাধারণের চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য ফ্রান্সের মত কোন লেখক বা দার্শনিকগণের জন্ম রাঢ় মাটিতে সেই সময়ে হয়নি। তখন বাংলায় বা রাঢ় দেশে কোন স্কুল, কলেজ ছিলই না। তখন ছিল উঁচু জাতের সংকুচিত পড়ানো কিছু টোল এবং উর্দু-আরবী পড়ানোর জন্য কিছু মাদ্রাসা। তবুও সেই সময় রাঢ়দেশের “অশিক্ষিত” আদিম বাউড়ী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বা অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ১৭৫৩ সাল থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬৩ বছর ধরে। আর ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল ১৮৯৮ সালে। তাই বিশ্লেষণ করলে ফরাসী বিপ্লব থেকে চোয়াড় বিদ্রোহকে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ‘বিদ্রোহ’ সাফল্য লাভ করলে তাকে ‘বিপ্লব’ বলা হয়। সরদার গোবর্ধন বাউড়ী বিদ্রোহ করে কর্ণগড়-এর রানী শিরোমণিকে কিছুদিনের জন্য উচ্ছেদ করেছিল। তাই এই চোয়াড় বিদ্রোহকে বিপ্লবও বলা যায়।

চয়ন-চতুর্থ দুনিয়া

গামছার শখ হয় খোপাবাড়ি যেতে

স্বপ্নময় চন্দ্রাবতী

এই সময় কাকগুলো খুব হৈ-হুলা করে। ওদের ডাকের মধ্যে কেমন মজা-কেমন মজা ভাব। মিড-ডে মিল সারা হয়ে যাবার পর কিছু কিছু এঁটো অন্ন পড়ে থাকে, ওই অন্নের কারণেই কাকগুলোর উচ্ছ্বাস। ওদের নিত্য নবান্ন। যা কিছু পড়ে থাকে, কাকেরাই সাফ করে। রতনের কাজ কমিয়ে দেয় ওরা।

রতন রুইদাস একটা ইঁসুলের পিওন। ঘণ্টা ও বাজায়, নোটিশ এর খাতা ক্লাশে ক্লাশে নিয়ে যায়। স্যারদের চা ও বানায় দিনে দুবার করে। নিচু কেলাসের পড়ানোর শুনেছে-দর্জি পাখি কাদের বলে? বাবুই পাখি। জমাদার পাখি কাদের বলে? কাক, কাকদের। কাকদের বেশ আত্মীয় আত্মীয় লাগে রতন রুইদাসের। রতনকে জমাদারের কাজও করতে হয়, কারণ ও রুইদাস। জাতে মুচি। ওর ঠাকুরদাদা মুচি ছিল। ইঁসুলে জমাদারের পোস্ট স্যাংশন নেই, তাইবলে কি স্যারদের হিসি হাও করার জায়গা নোংরা থাকবে। ও ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে, ফিনাইল দেয়। রোজ সকালেই এটা করে। ছেলেদের বাথরুম হপ্পায় দু-একবার সাফ করলেও চলে। আর, ও এসব করে বলেই প্রতিবার চা করার আগে লাল সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হয়। ইঁসুলের টিচার ক্রমে কেটলি করে চা নিয়ে যায় টিফিন বেলায়। তখন স্যারেরা গল্প করে, স্যারদের নানা আলোচনা কানে আসে। মাস্টাররা জ্বাতে উঠেছে। আজকাল মেয়ের বাপেরা বলছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অথবা ইঁসুল মাস্টার পাত্র চাই। কখনো আলোচনা হচ্ছে—মেয়েদের গায়ে দুটো টিপি আছে বলে ওরা ভেবেছে কি, ধানায় লাগিয়ে দিলেই ইন। সব আইন ওদের দিকে। ভাগ্যিস এটা শুধু ছেলেদের স্কুল। দেশ কত পাস্টে গেছে। এখন মুচিমৈথরদের হাতে খেতে আমাদের আর কেনও ইয়ে নেই...।

এই ইঁসুলের হেড মাস্টার সিডুল কাস্ট। কয়েকজন সিডুল কাস্ট মাস্টারও আছে। ওরা কিছু একটা বেঁটে করেছে। মাঝে মাঝে গাবতলায় মিটিং করে। রতনকে ডাকে না, তবে চালা নেয়। যারা সিডুল কাস্ট নয়, বড় জাতের, ওরা নিজেরা নিজেরা মাঝে মাঝে এস.সি. তুলে খিঁচি দেয়। সোনার চাঁদের ব্যাটার

মানে হ'ল 'ওরা'। আবার সেয়ানা চোদনা মানে ও এস.সি. রতন জানে। রতনের সামনেই ওরা বলে টলে। ওকে পাঞ্জা না দিলেও চলে। মাঠে হাগার সময় ব্যা যদি চেয়ে দেখে, লজ্জা করে কেউ?

রতনকে 'পারমেন' করেছে আগের হেড স্যার। সে অবশ্য বামুন ছিল। ওনার দয়াতেই রতন এখন 'ওরুপ ডি'। ব্যাংকে ওর নামে টাকা আসে। ওর চেক বই আছে, গোটা গোটা অক্ষরে রতন চেক বইয়ে সই করে—রতন চন্দ্র রুইদাস। এই ইঙ্কুলেই সেবেন কেল্লাস পর্যন্ত পড়েছিল রতন। তখন দোতলা হয়নি। রতনের বাবা বাড়ু দিত, জল ধোয়া করত মাঝে মাঝে, তখন কুঁয়ো পাইখানা ছিল একটা, ওটাও সাফ করত মাঝে মাঝে। রতনের বাপ মাসে বিশ পঁচিশ করে পেত। রতনের বাপ জন খচিত, ঘরামির কাজও জানত। চামড়া ছাড়ানোর কাজ করতে কখনও দেখেনি রতন। ওর ঠাকুরদা নাকি গরু মরলে চামড়া ছাড়িয়ে বেচতো। দেখেনি, শুনেছে। রতনের বাপ যখন মরেছিল, রতনের তখন নতুন নতুন গৌপ উঠতে লেগেছে। সেবেনের পরীক্ষাটা দেখনি। অংকটার মধ্যে নানা ইকড়ি মিকড়ি বুঝতে পারত না। এলজাবরা বলে যেটা ছিল, সেটা খুব ছুরকুটে। ইংরিজিটাও একদম বাগে আসত না। ওয়াটারকে Oatar, ব্লাডকে Blad এরকম লিখত। একদিন জীবন বড় সুন্দর ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে ডেথ ইস বিউটিফুল লিখেছিল বলে কী হাসাহাসি। জীবন ইংরিজি লাইফ, মৃত্যু ইংরিজি ডেথ। লাইফ আর ডেথ গুলিয়ে গেল বলে ছেড়ে দিল ইঙ্কুলে বাওয়া। চিরকা বাজারে মুরগি কাটত, ভীম দাসের অ্যাসিস্ট্যান্ট। বাড়ি এসে রক্ত ধুতো, গেঞ্জিতে লেগে থাকে রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে থাকত। ভালো লাগত না মোটে। মনে হল এর চেয়ে মাটি কোপানো ভালো।

বাপ মরার পর এই ইঙ্কুলে যায়। তখনকার হেডস্যার বলে লেখাপড়া কিছুটা জানিস যখন—লেগে যা। আমাদের পিওন নেই।

লেগে গেল সেই থেকে। ইঙ্কুল ফাঙ থেকে কিছু দিত। সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখন মোটা চাল ছটাকা কেজি, আলু দু টাকা। মাসে বাট-সত্তর করে পেত, বেড়ে বেড়ে ব্যায়ে বছরে তিনশো হয়েছিল, তারপর 'পারমেন'। একেবারে স্যাংসন পোস্ট। সরকারের ঘরে ওর নাম চলে গেল। একলাফে মাইনে বেড়ে ডবলের বেশি। মুচি পাড়ায় সত্যনারায়ণ দিল। ভদ্রলোকরা সত্যনারায়ণ

দেয়। মুচি পাড়ায় সেই প্রথম সত্যনারায়ণ হল। সিম্মিতে কাঞ্জু-কিশমিশ। রতনের বাড়িতে এখন রামকৃষ্ণ-সারদা মায়ের ক্যালেন্ডার আছে। দেয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি আছে। বামুন ডেকে সরস্বতী পূজোটাও করে। কেন করবে না! ওর ছেলোটা তো ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক পাস করেছে। সাইনস নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে। কলেজে পড়বে। অনেক পড়বে। পাশ দিয়ে এই ইঙ্কুলেই মাস্টারিতে ঢুকলে ওর মনে শান্তি। হ্যাঁ, মুচির ব্যাটাও মাস্টার হতে পারে, বামুনের ছেলোদের বলবে, কিরে, পড়া পারিসনি কেনে? হুকুম করবে—ওঠ, বেঞ্চির উপর ওঠ, কান ধরে দাঁইড়ে থাক...।

সেই সুরেন স্যার আর নেই। পড়া না পারলে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দিত রতনকে, রদুরে। বলত ছট করে বুট পায়ে নিয়ে মুচির ব্যাটা দারোগা হবে...। মাথ, মাথ এবার হয় কিনা। রতনের পো দারোগাই হবে। মাস্টার নয়, দারোগা। বাহক ফটফটিয়ে গায়ে ঢুকবে রতন রুইদাসের ব্যাটা। নাকি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার? থাক। দরকার নেই। অনেক খরচা।

রতনের ছেলের নাম ফাঘুনী। ওদের ঘরে এরকম নাম হয় না। মরন চাঁদ, হারাধন, চরনদাস এসব নামই হয়, বড়জোর রতন, হীরা, রাপো। রতন ওর এই নাম দিয়েছিল একটা বিডিও সাহেবকে দেখে। বড় সুন্দর দেখতে ছিল ওই স্যার। ফাঘুনী মিত্র। এই ইঙ্কুলে এসেছিল প্রাইজ দিতে। কিন্তু মুচিরা কি এসব নামের মর্ম বোঝে? ওরা ফালা ফালা বলে ডাকে। রতনের বউ যা হোক ফালা বলে না, কেগো বলে ডাকে। রতনও তাই ডাকত প্রথম দিকে, কিন্তু সবাই ফালা বলে, রতনও কবে থেকে যেন ফালা বলেই ডাকতে শুরু করে দিয়েছিল। ফালা ডাকলেই তো ছেলে ফেলনা হয়ে যায় না। ছেলে সোনার টুকরো। অঙ্কে খুব মাথা। ছোটবেলাতেই তেরো, চোদ্দ, উনিশের নামভা ফটাফট মুখস্ত বলে দিত। ফাইব কেল্লাসে ফার্স্ট হল। প্রাইজের দিন হেড মাস্টার হাঁকল ফাঘুনী রুইদাস... ফার্স্ট। ছেলের হাতে চিকমিক কাগজে মোড়া বই তুলে দিল পণ্ডপতি মাহাতো, রতনের চোখেও তখন চিকচিক জল। কে একজন বলেছিল গোবরে পদ্মফুল হয়েছে। কথাটা কিছু খারাপ লাগেনি রতনের। হোককে মুচিরা গোবর, ছেলাটা তো পদ্মফুল বটে। ও ফুইটো উঠুক, সব পাপড়ি মেলে দিয়ে ধামসা বাজিয়ে ফুটে ওঠরে পদ্মফুল।

এই পদ্মফুল কিম্বা ফ্যালার পায়ে বুট জুতো হল। বুট জুতোর খটখট শব্দে রতন ভবিষ্যতের দারোগার পদধ্বনি শুনতে পেত। ছেলের জন্য যোগেদের ঘর থেকে আধা ব্যাগাম ঘি নিয়ে এসে বউকে বলেছিল শুধু ছেলের জন্য। দুটো ছাগল ছিল খরে, ছেলেকে ছাগল চরাতে দিত না, জ্বালানি কুড়িয়ে আনতেও বলত না। লাউ গাছটার গোড়ায় এক গাবা ছাগল নাদি দে—এটুকুও বলত না। বাবুঘরের ছেলের মতন ফালা সকাল বেলা উঠে নিম কাঠি নয়—ব্রাশ-টুথ পেস্ট নিয়ে দাঁত মেজে পড়তে বসত। খাতা ছুড়ে ইকিরমিকির গ্যালজাবরা কষত। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ডাভাগুলিও খেলত না। পরলে ইঙ্কুলের মাঠে ক্রিকেট খেলত। দেখলে কে বলবে ও মুচি-ঘরের ছা? গায়ে কি জাত লেখা থাকে?

ওদের ইঙ্কুলের অঙ্কের মাস্টার ছিলেন চক্কোন্টি বামুন। দুটো গাঁ তফাতে থাকতেন। সহিকেল চালিয়ে আসতেন। ফালাকে ভালবাসতেন খুব। বলত বাড়ি চলে আসবি খাতা নিয়ে। ফালা চক্কোন্টি মাস্টারের বাড়ি যেত, ওখানে উনি অঙ্কের দোকান খুলে বসেছেন, কিন্তু ফ্যালার থেকে পয়সা নিতেন না। ওর পাকা পাইখানা ছিল, একবার পাইখানাটা এটকে যায়। বাকে বলে 'জ্যাম্প' হওয়া। চক্কোন্টি স্যার ফালাকে বলেছিল—যা বাবা, দেখনা, একটা খুঁড়িয়ে টুচিয়ে... ওকি এসব কখনও করেছে? এসব পাইখানায় হাণ্ডেলনি কুনসিন। মাঠে যাওয়াই তো অভ্যাস। ওরা তো খাঙর না, মুচি। যদিও রতনকে এসবও করতে হয়। ওদের হেড মাস্টারের বাড়িতেও এসব বামেলা হলে রতনেরই ডাক পড়ে, কিন্তু ফালা তো এসব করেনি কখনও। কিন্তু ফালা না করতে পারেনি। লাঠি খুঁড়িয়ে একটা ন্যাকড়ার দলা বার করেছিল। তারপর নোংরা শরীরে অন্যদের সঙ্গে বসতে পারেনি। ফালা জঙ্গ খেতে চাইলে ওরা জঙ্গ দিত, কিন্তু ওর আলাদা প্রাস্টিকের গেলাস ছিল। তা যাই হোক, চক্কোন্টি স্যারের জন্যই তো অঙ্কে হাই নম্বর পেল ফালা, রতন আর ফালা দুজনেই চক্কোন্টি স্যারের বাড়ি গিয়ে পেনাম করে এসেছিল। চক্কোন্টি স্যার বলেছিল—তাহলে এবার একটা লাইফ ইনসুরেন করেনে রতন। অনেকদিন ঘোরাচ্ছিস। কবে থেকে বলছি, এবার কর। চক্কোন্টি স্যার এটাও করেন। বহুদিন ধরে, মইনে বাড়ার আগে থেকেই।

—দুই—

এতগুলো টাকা কোথায় পাবে রতন? ভর্তি হবার সময় সত্তর হাজার টাকা,

তারপর বছর বছর বাট হাজার টাকা করে আরও তিন বছর। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জামাই জুতোর দোকান করবে বলে একগাদা টাকা নিয়েছে, বাড়িতে ও ইটের পাঁথনি করেছে, লাল সিমেন্ট দিয়ে মেঝে, মুচি পাড়ায় রতনের বাড়িটাই তো দেখনদারি হয়েছে। মা মারা গেলে খই ছড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে গেছে, খইয়ের সঙ্গে খুচরো পয়সা, বামুন ডেকে শ্রাদ্ধ করেছে, লুচি-তরকারি-বৌদের ব্যবস্থা ছিল, ইঙ্কুলের সব মাস্টারদের মাতৃশ্রাদ্ধে নেমস্তন্ন করেছিল, কিন্তু দু তিন জন এস.সি. এসেছিল শুধু। হেডস্যারও আসেনি। না আসুক গে, খরচাপাতি তো হয়েছে, সর্ব্বথ খরচ করে দিয়েছে রতন, পি.এফ-এ যা ছিল তুলে নিয়েছে। ভেবেছিল চিন্তা কী, ফালাতো আছে, ফাছুনী। পদ্মফুল। ওতো ফুটছে। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু রতন আগে ভাবেনি পদ্ম ফোটাতে গেলে এতগুলো টাকা খরচ করতে হবে। ইঙ্কুলে বারো কেলাস পর্যন্ত পয়সা কড়ি লাগেনি তেমন। চক্কোন্টি স্যার যিনি মাগনায় অঙ্ক, বিশ্বাসবাবু স্যার যিনি মাগনায় ইংরিজি পড়িয়ে দিতেন। ভেবেছিল বাঁকুড়া কলেজে বি.এস.সি. পড়ে চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু ফ্যালার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার শব্দ হল। জয়েন্ট দিল। জয়েন্টে যা নম্বর পেল, তাতে সরকারি কলেজে ঠাই মিলল না। গ্রাইভেট কলেজ হয়েছে অনেক, ওখানে পড়তে কঠিন খরচ। ওখানেই এস.সি. এস.টি. খাতির নেই।

ফালা বলেছে জেনারেল লাইনে গেলে বহুদিন ধরে পড়াশুনো করতে হবে। বি.এস.সি., এম.এস.সি. ... এত কি রতন বোঝে? রতন বলেছিল তিন বছর বি.এস.সি. পড়ে ইঙ্কুলের মাস্টারিতে কিম্বা থানার দারোগাগিরিতে লেগে যা...। ফালা বলেছে ওসব চাকরি কি তোমার হাতের বিড়ি নাকি, যে ফুঁকলেই হল? ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে সফটওয়্যারে চাকরি পাওয়া যায়...। রতন কি এতসব বোঝে? সফট মানে নরম—এটা জানে। মিড়ড়ে মিলের রান্না টেস্ করার সময় স্যারেরা মাঝে মাঝে সফট, হার্ড এসব বলে। হার্ড মানে শক্ত। কলেজেরে মুরগি হলে এসব কথা বেশি শোনা যায়।

বাড়িটা যখন ঝাড়াই-সারাই করতে গেল, তখন খাতড়া বাজারের হার্ডওয়্যার দোকানে যেতে হয়েছিল।

হেডস্যারও বলেছিলেন—রতন, ফাছুনিকে আইটিতে দিয়ে দাও, আইটির মার নেই, কয়েক বছর পর ভালো মইনে কড়ি হয়। কত ছেলে বিশেষে যায়, টাকা

জমিয়ে ফিরে আসে। ওঁনার কোনও ভাগনে জাপান নাকি জার্মান দেশে আছে।

কী ঝামেলায় ফেলে দিলি ফালা—রতন ভাবে। তিন চারটে প্রাইভেট কলেজে পেয়েছিল ফালা, কলকাতার কলেজ, বাঁকুড়ার কলেজে ও। বাঁকুড়ার কলেজে মইনোটা একটু কম, কলকাতায় বেশি। বাঁকুড়ার কলেজ হলেও হোস্টেলে থাকতে হবে। খরচ। টাকা জোগাড় করতে পারল না রতন। এতগুলো টাকা কে দেবে? গজগজ করতে করতে ফালা বাঁকুড়া কলেজে পড়ে, বাড়ি থেকে ‘সিন্ধুখরী’ বাসে যায়, ‘পালিয়া’ বাসে ফেরে। ও নাকি সামনের বছর ফের জয়েন্টে বসবে। সরকারি কলেজে ঠাই হলে খরচ কম, কিন্তু ওখানে ঠাই পাওয়া নাকি লটারি পাওয়ার মত। কঠিন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় হাই হাই নম্বর পেতে হয়, সে জন্য কোচিং নিতে হয়। সেই কোচিং এখানে কে দেবে? চক্কোড়ি স্যারেরও নাকি মুরোদ নেই সেই কঠিন কোচিং দেয়ার। ফালা বলেছে আমি জান দিয়ে চেষ্টা করব বাপ, কিন্তু সরকারি কলেজে না পেলে দুযোনা আমাকে। প্রাইভেটেই পড়ব। ইঞ্জিনীয়ার হব। সপ্তেকের বিরাট অফিসে কাজ করব। সপ্তেক গেছ কখনো, সপ্তেক? দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। উখানে ফালাটে থাকব, ওসব যায়গায় বামুন মুচি নমগুদুর সব এক ভিটেতে থাকে।

ছেলে কিন্তু পড়া লেখা করে। খুব পড়ে। উবু হয়ে পড়ে। ওর একটা কম্পিউটার নেই, কিনে দিতে পারেনি। ওটা থাকলে নাকি পড়ালেখায় সুবিধে। রতনের স্কুলের এক স্যারের সম্বন্ধী নাকি জমি বেচে ওর ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দিয়েছে। রতনের জমি কোথায়, যে বেচবে? সেই কবে, জমিদারের আমলে রতনের বাপের ঠাকুরদা গায়ের শেষে জমিতে ঘর বেঁধেছিল, সেই থেকেই ওরা আছে। এখন ওখানে বারো ঘর। শুধু ভিটেটুকুই আছে ওদের।

ছবি খিচা যায় এমন একটা মোবাইল কিনেছে ফালা। ফালা নিজের টাকাতেই কিনেছে। ফালা টিউশনি করে। একদিন সপ্তেকের ছবি দেখাল ফালা। বড় বড় অফিস বাড়ির ছবি। সুন্দর সুন্দর ছেলের ছবি। ওরা আই.টি বাবু। সুন্দর সুন্দর মেয়েদেরও ছবি। ফুল পেন্টালুন আর শর্ট জামা পরা। বলে তোমার ইচ্ছা করে না বাপ আমিও এমন জায়গায় চাকরি করি, টাইগলায় অফিস যাই...। ইকুলের মাস্টারি মানে তো সেই একটা ঘুসঘুসে বাড়িতে সাইকেল ঠেঙিয়ে গিয়ে ছাত্র হাঁকানো। রতন রইদাসের ছেলে ফাছুনী রইদাস ইঞ্জিনীয়ার, কোথায় চাকরি করে?

না সেক্টর ফাইব। এইতো ছেলে আমার কদিন পর জার্মান যাবে—বলতে ইচ্ছে যায় না বাপ।

ফালা বাঁকুড়া থেকে একদিন একটা কাগজের বাক্সো নিয়ে এসেছিল। ভিতরে ইকুর মিকুরি কেঁচের গাদার মত জিনিস। লংকাবাটার জল দেয়া। ও বলল এটা চীন দেশের খাদ্য। এখন বাঁকুড়া শহরেও মেলে। সবাই একটু করে কাঁচা সাপপাতায় ভাগ করে খেয়েছিল। বড়দিনের দিন কেক নিয়ে এল ফালা। হলুদ রঙের জরি কাগজে মোড়া। ভিতরে ভরা কিশিমিশি। রতন বুঝতে পারছে ও গ্রামশ ভদ্রের লোক হচ্ছে। ওর ছেলের ইচ্ছে আদালতে গিয়ে এনিউ ওপিঠ করে রইদাস পাশে শুধু দাস করে দেবে। ফালা আরও ভদ্রের লোক হতে চায়, পুরোপুরি ফাছুনী হবে। মিঃ ফাছুনী দাস।

খবরের কাগজ আসে ইকুলে। ওখানে কতরকম জিনিসের ছবি। সব কিছুর মানে বোঝে না। ছোট বাক্সো, বড় বাক্স, ঘুরন্ত চেয়ার, বিছানা, ছদোম খাটে ছড়ম গদি...। কলকাতা গিয়েছিল একবার, মিছিলে। কত কত কাঁচের ঘর। কাঁচের ভেতরে ঠাসা হরেক খাবার, হরেক পোষাক। ওসব ওদের জন্য নয়। ওরা শুধু দেখবে। দূর থেকে দেখবে। রতনদের ঘরে এখনও বিদ্যুৎ যায়নি। গ্রামে ইলেকট্রি এসে গেছে দু বছর হ’ল, কিন্তু গ্রামের কোনায় মুচিপাড়া বাগদি পাড়ায় এখনও খুঁটিও পৌতা হয়নি। অন্যদের বাড়ি গিয়ে টিভি দেখেছে রতন, দেখেছে বড়লোকের বিটরি মুখের ভিতরে আত্মদে গলে যাওয়া চকলেট আর আইসকিরিম। কাশফুল রং ঘরের ভিতরে শাপলা রং মেয়েদের গায়ে কি জানি কি রং ইলিক বিলিক শাড়ি। দু’জনে চা খাচ্ছে বারান্দায়, ঢেলে দিল এক কুড়ি বিপ্লুট খালার উপর। এই চকলেট ফালাকে ডাকে, এই হিরো হস্তা ফালাকে ডাকে, শাপলা রং মেয়েরা ডাকে, আইসকিরিম গলতে গলতে বলে ফালা তুই ফাছুনী হ। এইসব ডাক ফালা শোনে।

একপুঙ্খ এইসব শোনার ক্ষমতা জন্মায় না। তিন পুরুষ লাগে। রতনের বাপ ভুতো রইদাস ইকুলে বাড়পোছের কাজ পেয়েছিল বলে রতনকে ভাগাড়ের দিকে চেয়ে থাকতে হয়নি। রতন পারমেন গ্রুপ ডি। রতনও চকলেট আইসকিরিমের ডাক শুনতে পায়নি। ফালা শোনে। রতন তো বলতে পারে না ফালাকে, আমার বাপখন, ওসব শুনিস না, ওসব ডাকিনীর ডাক। আমরা মুচির জাত, ওসব

আমাদের জন্য নয়। কেন বলবে? মুচিরা তো লেখাপড়া করত না। গরুছাগলের চামড়া ছাড়াও, রোসে শুকোত। কেউ ঢাক বানাতো, ঢোল বানাতো। যুগ পান্টায় না? খাতড়া বাজারে বামুনের ছেলে জুতোর দোকান দেয়নি? আবার অগজীবন রাম নাকি মুচিঘরের লোক হয়েও কতবড় মন্ত্রী হয়েছিল। ফ্যালার কী দোষ। ফ্যালা ফাঙ্কনী হতে চায়। শুয়োপোকো প্রজাপতি হতে চায় তো, ওটা কি শুয়োপোকোর দোষ? কিন্তু শুয়োপোকোর ইচ্ছা ভগমান মেটায়। মানুষের ইচ্ছা ভগমান মিটায় না। মানুষকেই মিটিতে হয়। টাকা লাগে। টাকা দিয়ে ইচ্ছা কেনা যায়, কামনা-বাসনা কেনা যায়। কিন্তু টাকা কই? হয় টাকা হার টাকা করি, টাকারে না ধরতে পারি...

রতন রুইনাসের ভিতর থেকে ওর পূর্বপুরুষ বলে হা হতাশ করিস কেন রতন? নিচের দিকে দ্যাখ মুচিপাড়ার অন্যগুলোর দিকে তাকা, তুই বরাতজোরে গরমিষ্টের কাজ করিস, বছর বছর মাইনে বাড়ে, তোর বউ পাউডার মাখে, বেশ্পতিবারে পায় আলতা দেয়, অন্যসব? ওরা কি ভাবে আছে দ্যাখ না কেনে? তুই যদি আড়াইশো খাসির মাংস কিনে খাস, ওরা পায় নাই-ভুঁরি। তুই মাঝে মধ্যে চ্যাপ্টা বোতলের নাকি মদ গিলিস, রামের নামে নাম, ওরা গেলে চোলাই। তোর ছেলে খটর মটর পড়তে যাচ্ছে কলেজে, অন্যরা জন খটিছে, মুরগি কটিছে, ফড়ে গিরি করছে। নিচে তাকা শুয়োরের বাচ্চা, নিচে তাকা।

নিচেই তাকায়, ফের মুড়ুটা উঠে যায় উপরে। কি করবে রতন, ওয়ে ফ্যানের হাওয়া খেয়েছে, তোষকে শুয়েছে, শীতকালে মোজা পায়ে দেয়। মাছির মত ইচ্ছেগুলো ভন ভন করে। তাড়ায়, আবার আসে। রতনেরই যদি এমন হয়, ওর ছেলের কী দোষ?

শীতকালে বারান্দায় আগুন পোহাছিল রতন আর রতনের বউ। দুটো চ্যোলাকাঠে জ্বলছিল। ওখানে এক গোছা করগজ ফেলে দিল ফ্যালা। বর তোমরা ভালো করে আগুন সেক কর। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার কলেজের সব নাম ঠিকানার বইগুলো দিয়ে দিলাম। আগুন চাগিয়ে উঠল হ হ। তখন হাফাকার ওঠে রতনের বুক। পুড়ছে ছেলের ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার করগজপত্র।

—তিন—

চক্কোন্তি স্যারে ছেলেটা এসে রতনকে বলল বাবা ডেকেছে। চক্কোন্তি স্যারের খুব অসুখ। মাস খানেক ধরে ইকুলে আসছে না। শুনেছিল ন্যাভা রোগে ধরেছে।

কৈবর্তদের বাড়ির এক বুড়ি ন্যাভার মালা দিত, সে তো মরে গেছে, নইলে একটা ন্যাভার মালা দিয়ে আসত। ন্যাভা কে ডাক্তারবাবুরা বলে জডিস রোগ। স্যারেরা কেউ কেউ গিয়ে দেখে এসেছে। বলাবলি করেছে কঠিন জডিস। বাঁকুড়ায় বড় ডাক্তার দেখিয়ে এসেছে চক্কোন্তি স্যার। মৃত রক্ত পরীক্ষা করিয়েছে অনেক টাকা পরিসা খরচ করে। মৃত নয়, মূত্র, মূত্র। বড় মানুষদের পেছাবকে মূত্র বলতে হয়। আরও ভালো কথা হল ইউরিন। ইউরিন কথাটা মনে রাখা খুব সোজা। ইউরিনার সঙ্গে মিল আছে বড়। ইউরিনা, পটাশ এসব কথা সবাই জানে। জমিতে দিতে হয়। ইকুলের মাস্টাররা বলাবলি করেছে চক্কোন্তি স্যারের যে রোগ হয়েছে ওটা হেপাইটিস... ভুল হল... হেপাটাইটিস বি। নাম শুনেই বোকা যায় কট্টিন রোগ। রতন গেল চক্কোন্তি স্যারের বাড়ি। দেখল স্যার কত রোগা হয়ে গেছে। মুখ যেন ছাইমাখা। স্যার বিছানা ছেড়ে উঠতে নারছে। স্যার বলল রতন এলি? তোকে বড় দরকার।

স্যারের গিন্নি বলল—তোর মাস্টারমশাই এখন পাইখানা পেছাব বিছানায় করে। বেডপ্যান আছে। পাইখানাটাও দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার করে হয়। তুই বাপ ওসব পাইখানায় ফেলে দিয়ে, টিউকলে বেডপ্যানটা ধুয়ে আবার এনে দিস। এখন তো গরমের ছুটি পড়বে, সকালে এসে রাত্তিরে ঘর চলে যাস। রাত্তিরে আটকে রাখব না তোকে।

রতন মনে মনে বলল এজনা মেথরানি রাখলেই তো পারতেন, গায়ে কি মেথরানি নেই? আমার বাপ ঠাকুরা মুচি ছিল বটে, আমি তো পারমেন সরকারি কর্মচারি গ্রুপ ডি। আমি এই কাজ করব কেনে? কিন্তু বলতে পারল না। ওর কৃতজ্ঞতা বোঝ কাজ করল খুব। বিনি মাগনায় ফ্যালাকে অঙ্ক শিখিয়েছে। স্যার-গিন্নি বলেন কিরে, পারবি না? ঘাড় কাত করে রতন। ঘাড় যখন কাত করেই ফেলল, উপায় তো নেই, আসতেই হল। দুপুরে ভাত খেতে দিত। মাছের পাতলা ঝোল। বামুন বাড়ির কোলের স্বাদ বড় পানসা। হয়তো রুগীর ঝোল বলেই। দু-একটা অরকারি, ডাল। এরকম খাবার রতনও খেতে পারে। ও পারমেন গুরুপ ডি। ইন্ডায় একদিন চিকেন খায়। মাসে একদিন খাসী। ভদ্র লোকরাও এরকমই খায়। কিন্তু জাতে ছোট বলে ও ফেলতে যেতে হয়। খুব গন্ধ লাগে। পাইখানাটা ঘর থেকে একটু দূরে। উঠানের ওধারে। তারপর জলে বেডপ্যান ধোয়া। সু-পার জলে ধুলে পরিষ্কার হয়, মানুষ কিসে ধোয়া হলে পরিষ্কার হয় দয়াল? রাতে বাড়ি ফেরে রতন সাইকেলে। ফ্যালা বলে সাবান দিয়ে ভালো করে চান

করে এসো। রতন তাই করে। ফালা বলে হেপাটাইটিস খুব ছোঁয়াচে রোগ। আর রোগটাও খুব খারাপ।

রোগটা যে খারাপ সেটা বোঝাই গেল। চক্কোন্টি স্যার দিনে দিনে রোগা হতে লাগল। চোখ কোটরে ঢুকে গেল। ঘন ঘন বমি। গায়ের চামড়া কুনো ব্যাঙের মত খড়খড়ে। বাঁকুড়ার ডাক্তার কলকাতার কোনও বড় ডাক্তারের কথা বলল। বড় হাসপাতালের কথা বলল। সেখানে যাবার আগে কতগুলো পরীক্ষা করে নিতে বলল।

স্যারের ছেলে-মেয়ে প্রতিবেশীরা মিলে খুব আলাপ আলোচনা করল-কোলকাতার বড় দামি হাসপাতালে ভর্তি করে অন্যরা থাকবে কোথায়? কার আত্মীয় আছে কোথায় আছে। দেখা গেল নেই। তেমন আত্মীয়ই নেই যারা আশ্রয় দেবে। কলিকাতা শহর শুধু নেয়, দেয় না। ঠিক হল হোটেল খাকা হবে, আর কি একটা দামি হাসপাতালে স্যারকে রাখা হবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা হবে সকালে।

রতন 'মহামারা' বাসে বাঁকুড়া যাবে। একটা ছোট্ট থলের ভিতরে কৌটো শিশি। ওতে চক্কোন্টি স্যারে পাইখানা প্রচ্ছাব। স্যারের হিঁকা উঠেছে। দুর্গা দুর্গা বলে বেরল রতন। উঠান পেরিয়ে বাঁশের দরজা, তারপর কাঁচা রাস্তায় আমড়া গাছের তলায় যেতেই কল্লার রোল শুনতে পেল।

খুব খারাপ অসুখ এটা। ফালা ঠিকই বলেছিল। মৃত্যু। আর খুব ছোঁয়াচেও এটা। আর এ রোগের জীবাণু থাকে পেছাবে। রতনের বাপে চক্কোন্টি স্যারের পেছাবে। ওখানেই লুকিয়ে আছে মৃত্যু। মৃত্যু বলে টু-উ-উ-কি...

একটা মৃত্যুর অনেক টাকা দাম। ফালা যখন পাশ দিল, তখন চক্কোন্টি স্যার একটা লাইফ ইনসুরেন করিয়ে দিয়েছিল। দু লাখ টাকা। মরলেই দু লাখ। ফালা পাবে, ফালা। ফাঁস দিয়ে মরলে হয় না, কোনওরকম আত্মঘাতী মরলে টাকা পাওয়া যায় না। রোগে মরলে পাওয়া যায়—রতন জানে। রতন মরলে টাকা পাবে ফালা।

ফালাকে, তুই তবে ফাদুনী হ। ফুল হয়ে ফোটরে মুচির ব্যাটা। আইটি বাবু হবি, টাই বুলিয়ে গটগটাবি...। গামছারও সাধ হয় ধোপা বাড়ি যেতে... কাছিমেরও সাধ হয় চিং হয়ে শুতে। শুধু এক চুমুক। ব্যাগ থেকে শিশিটা বের করে রতন। ডেথ ইজ বিউটিফুল... ছোটবেলার ভুল ট্রান্সপ্লেশনে কি খুব ভুল করেছিল রতন?

□

উড়ানের স্বপ্ন

সফ্রেটিশ ভারতী

এক

একটি অঘোষিত, অকল্পিত হরতাল। কোন রাজনৈতিক দলের মদত ছিল না। মায় কোনো বুদ্ধিজীবী গতি বুকে হাওয়া মোরগ হয়নি। তবু কলকাতা শহরটা প্রায় অচল। বিদ্যাপুর ডকইয়ার্ড এলাকার দারোগার অবস্থা ভীষণ সঙ্গীন, সে দু'দিন বউ-র ভয়ে বাড়ি যায়নি। অথচ তার ভয়ে বিদ্যাপুর এলাকার মাফিয়ারা জামা কাপড় নোংরা করে ফেলে। বউ তাকে আন্টিমেটাম দিয়েছে—যেদিন একটা কাজের মাসি বগলদাবা করে আনতে পারবে, সেদিনই বাড়ি ফিরতে পারবে। নতুবা তোমার জন্য বাড়ির দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ। ফৌজপারি কোর্টের জজ সাহেবের অবস্থা দারোগার থেকেও কাহিল। সে বউকে শুধুমাত্র বলেছিল—একটু আধটু বাড়ির কাজ করলে জাত যায় না কি। বউ খুঁটি বাগিয়ে এসেছিল—এই, এই শোনো, বাড়িতে জজগিরি ফলাবে না তো। জ্ঞানের কথা শোনাতে হয় পেশকার বাবুদের বলবে। যারা তোমার নাকের ভগায় কেস রেকর্ডে লুকিয়ে টাকা নেয়। গুড় পায়, শুনতে ওদের মিষ্টি লাগবে। কাজের মাসি না আসা পর্যন্ত একদম কোর্টমুখী হবে না। তোমরা নিজেদের ভাবো সর্বশক্তিমান। কিসের শক্তিমান? খলিয়া জরি করে একটা কাজের মাসি ধরে বেঁধে আনতে পার না। জজ মিনমিনে বলার চেষ্টা করল—আহা দেশের আইন কানুন বলে তো একটা কথা আছে। তুমি কি তোমার কাজের মাসিদের অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার দাও? ন্যূনতম মজুরি, পি.এফ, ই.এস.আই. কিছু দাও? তা হলে ওদের উপর কোন আইন খাটাব, বলো?

জজগিরির মাথা আরো তেতে গেল। সে ঝঁকিয়ে উঠল—খ্যাত, রাখো তো তোমার আইনের কচকচানি। কোর্ট যেন সব কাজ আইন মেনেই করে। আমাদের খাটাবে না তো। বুকলে, সতের বছর ধরে জজ উকিল নিয়ে ঘর করলাম, তোমাদের হাড়ির খবর আর জানি না? কিছুই যখন পারবে না, কোর্টে টেবিল পিটিয়ে অর্ডার, অর্ডার করার বদলে তুমি রোজ ঘর মুছবে। রাঁধুনিটাও তো ভেগেছে, হাত পুড়িয়ে ছাইপাশ যা পারি দু'টো ভাত আমি ফুটিয়ে নেব।

হরতাল শুরু হওয়াতক কোনো জজই কোর্টমুখি হয়নি। কেরানিবাবু অফিস আসেনি। মার্কেটহিল ফার্মের ম্যানেজার চাকরি খোয়ানোর হুমকি গিলেও চুপচাপ বাড়িতে বসে আছে। কোনো বাড়ির কাজের মাসি আসছে না তিন চারদিন ধরে। শহরে গাড়িঘোড়া কম। অফিস আদালত প্রায় খাঁ খাঁ। একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে গোটা শহরটা অচল করে দিয়েছে। খুঁচিয়ে তুলছে গনগনে আঁচ। সে আগুন ঘুমিয়েছিল দাস যুগের বুকে। অত্যন্ত তুচ্ছ কারণেই কি না মেয়েটি খুঁচিয়ে দিল দুমস্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ।

মেয়েটি শেফালি। বলা নেই কওয়া নেই শ্যামলা ছিপছিপে মেয়েটি একদিন সকালে একটি প্লে-কার্ড নিয়ে বসে পড়ল শহিদ মিনার চত্বরে। লম্বা মনুমেন্টের নিচে ঘাসের মতো সে। নিচু এবং চাপা স্বভাবের। মেয়েটির উপস্থিতি এতই নগণ্য যে মিডিয়ার চোখ এড়িয়ে গেল। পাবলিক না খেলে মিডিয়ার অবশ্য কি দায়? পথ চলতি দু-একজন কৌতূহলী মানুষজন দেখল—এক বন্ধা মেয়েটি একটি চটাইয়ের উপর হাতে লেখা পোস্টার সাঁটিয়ে উঁচু শহিদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আছে। পোস্টারে লেখা—“কাজের মাসিদের হেয় করা লেখক, বুদ্ধিজীবী নিপাত যাক। ‘মায়ার খেলা’-র লেখকের শাস্তি চাই।” দু-একজন যদিও বা অন্তর্ভাবমীর মতো হাসল, অন্যরা বলল—দেখ পাগলের কান্ড। কিন্তু হাওয়ার পায়ে তাড়া ছিল। কেটে যাওয়া শিমুল তুলোয় লুকিয়ে হাওয়া সে খবর ছড়িয়ে দিল সবখানে। ক্যানিংগামী থি-স্পেশালে, বনগাঁ লাইনের ঘাম জ্বাঝ্যাবে ছিবড়া মানুষের কানে কানে কে যেন শুনিতে গেল শেফালির পোস্টারের মন্ত্রগুপ্তি। বিকেল গড়াতেই বেশ কিছু কাজের মাসি, রাঁধুনি বা বাড়ির কাপড় কাচা মাসি এসে হাজির। কেউ জানে না তারা কেন এসেছে অথচ সবাই অন্তরে শুনেছে শেফালির ডাক।

গোটা চাঁদ ছিল সারারাত আকাশ জুড়ে। মনুমেন্টের মাথায় এসে চাঁদ যেন আটকে গেল একটু বেশিক্ষণ। শহিদ মিনারের চারদিক ঘিরে তখন মাথায় মাথায় গিজগিজ। কিছু দূরে একটা পুলিশের টলহদারী জিপ ঠায় দাঁড়িয়ে। তাদের চোখ তালুতে ডলা খৈনিতে নেই। চোখে রসালো বিলিক। অন্যদিকে জড়ো হয়েছে কিছু রাতের ফেউ। ওঁত পেতে আছে অন্তত একটা দলছুট মেয়ের অপেক্ষায়। সুযোগ পেলেই টেনে নিয়ে যাবে নির্জন গড়ের মাঠে। শহরটার রাতের যন্ত্রণা কাতর চিংকার শোনার ফুসরৎ নেই। শহর মেতে থাকে নিজস্ব নীল নেশায়। কিন্তু

মেয়েগুলো, প্রৌঢ়া মায়েরা এককাটা, হাতে হাত ধরে বসে আছে চাঁদ মাথায়। সেই শীর্ণ মেয়ে শেফালি শহিদ মিনারে ভিতের উপর দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছে—আমাগো সামনা সামনি লোকে মাসি বলে ডাকে বটে। আড়ালে বা কখনও সামনেই সবাই বলে কাজের মাসি, বি, কাজের লোক, চাকর। বাবুরা দেহজীবীদের জন্য যৌনকর্মী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি তোলে কখনও কখনও। কিন্তু আমার মা বোনেরা, আপনারা কখনও কোনো বাবুকে বলতে শুনেছেন বাড়ির কাজের লোকদের গৃহকর্মী বলতে? বসে থাকা মহিলারা চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদের একজন দাঁড়িয়ে বলল—না, না। কোনো বাবু, এই কথা কইবে না। বেশ্যাগুলোকে যৌনকর্মী কইরা বাবুরা দ্যাখাইতে চায় অরা কত ভালমানুষ। অগো এই ভালমানুষ সাজতে পয়সা লাগে না। কিন্তু আমাগো গৃহকর্মী কইলে গাটের কড়ি খশতে পারে। তা বাবু বিবির ভাল কইরা জানে। তুমি তোমার কথা কও বইন।

— আমার নিজের আর কি কথা? আমি জানি অভাবের চাপে আমাদের প্রায় সকলেরই লেখাপড়া খুব একটা হয়নি। আপনারা জানেন না আমাদের নিয়ে কতকত চটুল গল্প লেখা হয়? দশটা গল্প লিখলে পাঁচটা লেখে কাজের মাসিদের নিয়ে।

— কও, কও আমাদের নিয়া কি লেখে বাবুরা? — সমস্বর বলে উঠল।

শেফালি তাদের চোখে উৎসাহ বিলিক দেখল। বলল — বুঝলেন মা-বোনেরা, আমি যতটুকু জানি বলব। এখানে আমরা এসেছি আমাদের কথা বলার জন্য। গল্পের মায়ী আমরা নই। তার আগে আমার জীবনের দু-একটা কথা বলা দরকার। আমি জান হওয়াতক মায়ের সাথে কাজের বাড়ি যেতাম। প্রথম প্রথম মায়ের আঁচল ধরে ঘুরতাম। তারপর একটু ভয় ভাঙতে শুরু করেছিল। কাজের বাড়ির বড় বড় ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়াইতাম আড়ালে আবডালে। আমাদের নারকেলডাঙ্গা বস্তির ঘরে দমবন্ধ হয়ে আসত। খোলামেলা ঘরে একটু দমকা হওয়া লাগত। আর জুঁত মালিকের ছেলেমেয়েদের অকচিতে ফেলে দেওয়া এঁটো খাবার। সেটুকু খাবারও ছিল আমার কাছে অমৃত। পরে অবশ্য বুকেছিলাম এঁটো কাঁটা খাবারের বিনিময়েও মাকে খানিকটা বেশি কাজ করতে হত। ছোঁড়া, ফটা বই—এ পড়তাম—অ - আ — বস্তির ফোঁটা আর চোখের জলের ফোঁটা ঝরে পড়ত বই-র পাতায়। লড়তে লড়তে মাধ্যমিকে পাঁচটা লেটার নিয়ে যেদিন পাস

করলাম, আমার মা আমাকে বাবুদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। রেজাল্ট দেখাতে বাবুদের সেদিন কি গর্ব — যেন সব কৃতিত্ব ওদের। ভাবখানা এমন যেন অভাব মেয়েটাকে ওরাই পড়িয়েছে। ফোনের ওপাশে আমেরিকায় থাকা মেয়েকে বলেছিল—শুনছিস কুলা, আমাদের কাজের মাসির মেয়ে পাঁচটা লেটার নিয়ে পা করেছে...

... হ্যাঁ, হ্যাঁ আমাদের বাড়িতেই তো খাওয়া পড়া করেছে, সেই মেয়েটা...

... কি বললি? ...

... ও তুই ওকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাস। ... হ্যাঁ, হ্যাঁ মেয়েটা চালাক চতুর আছে। তোর সংসার সামলে নিতে পারবে। অ্যা ... না, না আমি বলে দেব।

... আরে বেতন নিয়ে ভাবিস না। এক ডলার সমান ষাট-পঁয়ষাট টাকা। যা হু একটা দিবি। আমেরিকায় থাকবে সেটাই তো ওদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য।

ওই বয়সেই বুঝেছিলাম বাবু মোক্ষম চাল চালতে যাচ্ছে। এঁটো-কাঁটার বিনিময়ে আমেরিকায় আমাকে বেগার খাটতে পাঠাতে চায়। অধিকাংশ ভারতীয় মেম-সাহেবদের আমেরিকায় গৃহভৃত্য রাখার মুরোদ নেই। ভারত থেকে সম্ভার বেগার চাই। মাকে নিয়ে পালিয়েছিলাম বাবুর খপ্পর থেকে। খুদ খুটে যেতে যেতে আমি এখন এম.এ. পাস করেছি। এখন আমি বাবুলেখকদের লেখার উন্টোপিট পড়তে পারি। পুরাতন ভৃত্যকে সব সময় চোর হতে হবে। মুনবের জন্য নতুন প্রাণ দিয়ে নির্বোধ ভৃত্যকে মহান হতে হবে। এ ছিল আগের গল্পকারদের গল্পবলার ধরণ। এখন 'মায়ার খেলা'য় মায়ারা নাকি চালাক চতুর কাজের মাসি। ফ্রাট বাবুদের অফিস কামাই করাতে জুড়ি নেই এদের। বড়লোকের ছেলে ফাঁসাতে কাজের মাসিরা আপন মেয়ের যোনি পেতে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। বিপদে পড়লে কাজে না এসে মালিককে বাধ্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। এক খেলা শেষ হতে না হতেই মায়ারা মেতে যায় অন্য খেলায়। অকৃতজ্ঞতার খেলা অথবা অন্য লেখক লেখে—রাখালবাবুর কাজের মাসিটা ভাল। বাকি সব ঠগ প্রতারক। ছোটজাত। এসব নাকি আপনার আমার জীবনের গল্প। সাব-অলটান দরদি লেখক। ফ্রাট বাড়ির গিরিদের দিবানিদ্দার মুখরোচক রসদ আমরা। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবনের গল্প জানি, যা এ সব কাহিনির উন্টোপুরাণ। আমাদের হাজার যন্ত্রণার কাহিনি। আমরা জানতে চাইব—লেখক, তুমি আমাদের

জীবনের কতটুকু জানো? আমাদের সর্বব্যাপি দুঃখ অনুভূতির কতটুকু জানো? না কি সবটাই ভাবের ঘরে চুরি কর আমাদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে?

শহরের চাঁদ নেমে পড়েছে গঙ্গায়। ক্যানিং থেকে সকল পাঁচটার কি-লোকাল শিয়ালদহ সাউথে এসে বেমেছে। বনগাঁও, লক্ষ্মীকান্তপুর, শান্তিপুরের ভোয়ের ট্রেনগুলি উগরে নিচ্ছে শহরের এঁটো-কাঁটা ঘাঁটা মাসিদের। রীধুনিদের আর বাবুবাড়ির ঝাড়ুদারদের। শিয়ালদহ-হাওড়া স্টেশন মলিন বসনা নরনারীদের ভিড় উপচে পড়ছে। চাকরিজীবীরাবু, যারা শান্তিনিকেতন-আসানসোল বা কৃষ্ণনগরে ভেঁইলি প্যাসেঞ্জারি করে তারা অন্যদিনের মতো নাকে কমালাচাপা দিয়ে গাড়ির দিকে ছুটছে। এটাই তাদের রোজনামচা। মাসিদের শাড়ির ভোদকা গন্ধে তাদের বমি পায়, পেট থেকে উগরে আসতে চায় ভাত। যথা সম্ভব জামা কাপড়ের ছোঁয়া এড়িয়ে চলে। দূরপাল্লার ট্রেন পৌঁছায় বেলা বারেটায়। অফিস ফিরতি ট্রেন তিনটায়। সকালবেলায় যাত্রীরা অবাক—মাসিদের কাজের বাড়ি যাওয়ার তাড়া নেই। আট-দশটা বাড়ির এঁটো-কাঁটা বেঁটে কর্তা গিল্লিকে অফিস পাঠানোর তাগিদ নেই। গোটা শহর ধর্মতলামুখী। স্টেশন থেকে ধর্মতলা, বস্তি থেকে রাজপথ, সব একমুখী। অলি-গলি সব গিয়ে মিশেছে শহিদ মিনারের পাদদেশে। তাদের কানে যেন সেই বাঁশিওয়ালার বাঁশি। দারিদ্র্যের আর পিছুতান নেই আজ। মানুষগুলো অভাবী উপোশ ধাকাতে অভ্যস্ত। শহিদ মিনার ঘিরে অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত নরনারীর জটলাটা ক্রমে বিস্তৃত হল সিঁদু-কানন ডহর থেকে ধর্মতলা মেট্রো পর্যন্ত। তাদের কেউ একজন গান শুরু করল—খিদের আগুনে জ্বলতে পারি / অনাহারে মরতে পারি / তবু বাবুদের মিথ্যা ভাষণ শুনব না, শুনবা না / আর শুনব না...

অন্যরা দোহা তুলল — মিথ্যা ভাষণ শুনব না, আর শুনব না।

সূরের মধ্যে কেসুর লাগল ঠিকই কিন্তু সেই মিশেল সুরটাই যেন সবার মধ্যে তড়িৎ বাহিত হয়ে গেল। প্রতিরোধ পিঁপহার।

শেফালি আবার উঠে এল শহিদ মিনারের পাদদেশে। আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলল—মা-বোনেরা, তোমরা এখন একটু চুপ কর। আমরা একে একে শুনব কাজের বাড়িতে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা। দুঃখের কথা। কে বলবে, এখানে উঠে এসো। মধ্য ত্রিশের একটি বৌ উঠে এল পাদদেশে। তারপর বলল — মুই করিদা লকর। কখনও কথা কই নাই গো। ডর নাগছে। তমু কইতে চাই।

মুই, না-মানে মুই একটা চোর ছিলাম।

জনতা সম্বন্ধে চিৎকার করে উঠল—না কোনো চোরের কথা শুনব না। তুঁি নেবে কেটে পড়।

— না। যামুনি। কুন্দির কথা কইবার সুযোগ পাই লাই। পাইলেও কইতে পারি লাই। শুনে আকটু সবাই। বাপটা মইরল মোর তখন বয়স ছিল বারো তের। আমাগো একজন চেনা-শুনা নোক সংসারটারে বাঁচান নইগ্যা আই যে পাক সার্কসের নিয়াজ আলির বাড়িতে আমারি কাজে নাগাই দিল। আমারি সিঁড়ি লিটে শুইতে দিত। সিঁড়ির লিচটায় কতো দামি পাথরের মেঝে। বাড়িতে শুইতাম মটি পোতার উপরি। পেখম পেখম তাতেই মোর আনন্দ ধীরত না। বারো তোরে বছরের মাইয়া সবার আগে ঘুম থেকে উঠতাম, ঘুমাতাম সবার পরে। প্যাটে খিদার ঘোড়া দৌড়হিতে নাগত। তারা খাওয়ার পর আখখালা ভাত আর একটু ডাল দিত। নিয়াজ চাচার বাড়িতে সবদিন গোস্ত হইত। কিন্তু আমারে কোনেদিন দুই আককানা দেয় তো অন্যদিনও তাও দেয় না। খিদটা প্রায় কোনে দিনই মিটত না। এই মোর মাখার থাইক্যা অনেক বড় ছিল নিয়াজ চাচার ফিরিজ। তাকে তাকে সাজানো থাকত গোস্ত, বিরানী আর ফিরানী। খাবার শুলান তো মুই-ই সাজাই রাইখতাম। লোভ নাগত। নিয়াজ চাচা ব্যবসার কাজে দুপুরে বাড়ি থাকত না। চাচী গতর লড়াতেই পাইরত না বইললে চলে। সারা গায়ে মাংস থইল থইল কইরত। চাচী ঘুমাইলে কখনও কখনও চুরি করইয়া একটু আটু খাইতাম। অতো খাবার থাইক্যা একটু আখটু বইলে ধীরতি পারত না। একদিন চাচী বাথরুমে বইতে গিয়া আমারি সেইখা ফেইলল। চাচী নিয়াজ চাচারে ফোনে বাড়ি ডাইক্যা আইনল। নিয়াজ চাচা আমারি চাইপা ধরল। চাচী আমার জামা প্যাট একে একে খুইল্যা ফেঙ্কল। তারপর গ্যাসের আগুনে খুনতি পোড়াইয়া আমার ছোট বুক উপরি, আমার দুই ঠ্যাঙের মাইজ খাইন চেপে ধরল। আমার জীভ বেরিয়ে আইছিল। চাচার ভারি শরীল আরো গের্গে বইসল। তখন আমার দুধের কুঁড়ি সবে উঠতে ছিল। আপনারা দ্যাখেন কুঁড়ি বছর পইরও আমার বুক দুইডা আর পেছাপের জায়গা কেমনি পোড়া দাগ হইয়া রইছে।

ভিড় নিশ্চূপ নিখর। তার মধ্য থেকে একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল — খাউক দিদি, ক্ষতের দাগ দেখাতে হবে না। আমার পাছায় পিঠে অমন দাগের

মালা আছে। এমন অত্যাচারের দাগ আমাদের অনেকেরই শরীরে আছে। ওরা আমাদের খনে মানে, প্রাণে মারে। ধানা-পুলিশ, পেপার সব ওদের কেনা গোলাম। তারপর 'মায়ার খেলা'র লেখকেরা অবিরাম গল্প ফেঁদে যায়। অফিস আদালতে দিনের বড় অংশ কাটায় কাজের মাসি নিয়ে মাস্করা করে। আমরা প্রায় সবাই জানি আমাদের জীবনের কথা। তবু বলে খানিকটা দুঃখের চাপা পাথরটা হাফা করতে চাই। জানেন আমার অপরাধ ছিল — পাঁচ বছর একই মাস মাইনেতে বাড়পোছ করার পর বছরে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়াতে বলেছিলাম। আমার পাছায় সঁাকা দিল সেই কাকিমা, যে গর্ব করে অভ্যায় বলত তার স্বামীর তেইশ বছরের চাকরিতে বেতন বেড়েছে ছাব্বিশগুণ।

ভিড়ের মধ্য থেকে বলতে উঠল অন্য একটি মেয়ে। তার চেহারা আর পোষাক আশাক জড়ো হওয়া কাজের মাসিদের থেকে বিলকুল আলাদা। জ্যোৎস্নায়ও বোঝা যাচ্ছে তেল জল মাখা চেহারা। সে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল — আমি যে কথাগুলো বলতে চাই তা ঠিক আপনাদের বলা কথার সাথে খাপ খাবে না। তবু আমি বলব। আমি একজন কাজের মাসির মেয়ে, সেলা। আমার মা পাঁচ দশটা বাড়িতে কাজ করত। এই সেদিন পর্যন্ত করেছে। এখন আমি একটা কলেজে পড়ছি। মা'কে কাজ করতে দিই না। আমি বলতে এসেছি সত্যেনদাদুর কথা। আমি আজকে যে জায়গাটায় পৌছেছি তা মায়ের কাজের বাড়ির মালিক সত্যেনদাদুর জন্য। কাজের মাসির সাথে যেমন তার ছোট বাচ্চা মাঝে মাঝে কাজের বাড়ি যায় আমিও যেতাম। সত্যেনদাদুর বাড়ি বাদে অন্য বাড়িও যেতাম। কিন্তু ক্রমশই বুঝলাম সত্যেনদাদুর বাড়িটা আলাদা। আমি সেই ছুটমস্তুর মেয়েটা যে সত্যেনদাদুর বাড়িতে ছেটি দু'টি বেনী দু'লিয়ে দৌড়াতে সারা ঘর। দাদু তার অন্য নাতি-নাতনিসের মতো আমার সাথে লুকোচুরি খেলত। একদিন দাদু বলল — সেলার মা, সেলাকে আমাকে দাও। ওকে মানুষ করে দিই। ওর মেধা আছে। লেখাপড়া শেব হলে তুমি তোমার মেয়ে ফিরিয়ে নিও। দাদু-নাতনির ভাব ভালবাসটুকুই আমার প্রাপ্তি। আমার অন্য কোনো চাহিদা নেই। আর একটা কথা — তুমি আমাদের বাড়ি আর কাজ কর না। তোমার কাজের অভাব হবে না। তোমাদের সসোর যেমন চালাচ্ছ চালাও। সেলার ভরণপোষণটুকু আমাকে করতে দাও। সত্যেন দাদু আমাকে বিনা স্বার্থে মানুষ করেছে। আমার

ইটুর বয়সী কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদী তোমার সামনে দিয়ে ভ্যাং ভ্যাং করে নেতা বনে যাবে। যার চেহারা চলকে উঠবে আভিজাত্যের ফিনফিনানি। অথবা আদ্রির ধুতি পাঞ্জাবিতে সাদা কদমচুল। আমিও চল্লিশ বছর ছিলাম এদের খেলার পুতুল। আমাদের দরকার হত বাস্তা ধরতে আর জীবন বাজি রেখে অ্যাকশন স্কোয়াডে নাম লেখাতে। তুমি নিম্নবর্ণের, অ্যাকশন স্কোয়াডে মরতে পার কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পার না। ওদের রং চিনতে বড় দেরি করে ফেলেছি। সাবধান বন্ধুগণ—বহুশ্রমীরা এসেছে আমাদের আন্দোলন কেড়ে নিতে।

জনপন্থী নেতারা বোধ হয় কৃষিকার মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তাদের কেউ একজন মিডিয়া বাইট দিল এভাবে—আমাদের দল দেশের মণিষীদের আদর্শে বিশ্বাস করে। ভূইস্বৈর্গদের মতো বিদেশ থেকে আমদানি করা অচল মতবাদে আমাদের আস্থা নেই। গান্ধী দেশের অজুত ভাইদের হরিজন বলে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। বাবা সাহেব ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে আমরাই সংবিধানের জনক বানিয়েছি। এদেশের মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী দল। আমাদের দল এই আন্দোলনের পাশে আছে। বিকালে দলবল নিয়ে আসরে নামল আর এক দলের দাপুটে নেতা। সে তার ফ্রেন্শকটি দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল—আরে ছাড়ুন তো ওদের কথা। মানুষ ওদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আমাদের নেত্রীকে দেখুন। গান্ধীবাদি নেতাসহ তামাম দুনিয়া তার সততায় মুগ্ধ। আমাদের নেত্রী-নিজেই মৃত্যু হয়ে গেছেন। কে মাটির মানুষ তা জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। মা, বোনেরা আপনারা চিন্তা করবেন না। আমাদের সাথে থাকুন—আমরাই পারি আপনার অধিকার আদায় করতে। আপনারা নিরাপত্তা দিতে।

মহিলাদের আতঙ্ক ঢেকে দিল নেতার মুখ। কোথা থেকে যেন ধ্বিঁতা মা-মেয়ের কান্নার ধ্বনি ভেসে এল। তাদের মধ্যে উপস্থিত কি কেউ কাঁদছে? কাজের মাসিরা তখন এককট্টা। নেতাদের জনে জনে তারা বলছে—আমাদের আন্দোলন অরাজনৈতিক। দয়া করে আমাদের ভাবনা আমাদের ভাবতে দিন। আমাদের কথা আমাদের বলতে দিন। তবু নেতাদের আনাগোনা চলতে লাগল। কে আগে হইজাক করে নিতে পারে আন্দোলনটাকে। সামনে কত সমীকরণ।

সন্ধ্যা নামতেই পুলিশ আর রাজকর্মচারীরা এল। সাথে লালবাতির পুলিশ।

এইসব রাজকর্মচারীদের কাজের মাসিরা অনেকেই চেনে। কেউ আমলা, কেউ জাঁদরেল পুলিশ। এ সব তুচ্ছ মানুষদের এখন তারা খানিকটা তোয়াজ করে কথা বলেছে—বন্ধুগণ, সরকার আপনারা ব্যাপারে সচেতন। কোন লেখক কি সামান্য দু'টা কথা বলেছে বলে আপনারা ফালতু হয়ে যাবেন তা কখনও হয়? আপনারা দেশপ্রেমিক, দেশগড়ার কারিগর। আপনারা বাড়ি ফিরে যান। মন নিয়ে কাজ করুন। আমরা আপনারা সাথে আছি। সরকার ভাবছে কী করে আপনারা সমস্যার সমাধান করা যায়।

যে আমলা এতক্ষণ মাখন লাগানো কথা বলল, আলো মন্ডল তার বাড়িতে কাজ করে। আলো প্রতিদিন মালিকের উপর পুষে রাখে রাগ। মনে মনে গালি দেয়—শালা নেড়ির বাচ্চা। কাজ করিয়ে ঠিকমতো পয়সা দেয় না। পয়সা দিতে গেলেই হত ঘেউ ঘেউ। অথচ বিলাতি কুস্তার পিছনে কত টাকা খরচ করে। বাজারে নতুন গাড়ি এলেই পুরনোটা বেচে দেয়। সরকার নাকি সংসার চালায় ধার করে, তবে তার কর্মচারীরা এত টাকা পায় কোথায়? আলো নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, সে বলে উঠল — ও দাদা মুই আলো, আপনার বাড়িতে মাসিদের সাথে এতটা মলম লাগিয়ে কথা কন? দু'বেলা মাসিদের নিশামন্দ না করলে তো পেটের ভাত হজম হয় না। আমরা নাকি এবাড়ির কথা ওবাড়ি চালান করে দিই। কিন্তু আপনারা ভ্রমশ্রমীরা যা সব কেছা করেন তার কতটুকু দুনিয়ার নোক জানে?

আমলার পাশে সমপদ মর্যাদার একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়েছিল। তার মেজাজ গেল খিজড়ে। তিরিক করে সে তেড়ে গেল — কে রে মাগিটা? এত বড় দুঃসাহস মুখে মুখে কথা বলে! লাই পেয়ে মাথায় উঠেছিস? শালী রাগি, আছুলা হুড়কো ঢুকিয়ে দেব। আজ রাতের মধ্যে শহিদ মিনার চত্বর ছেড়ে দিবি তোরা, নইলে পেরিয়ে বৃন্দাবন ছুটিয়ে দেব। দেশের আইন কানুন কি তোদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে? সকালের মধ্যে জায়গা ফাঁকা না করে দিলে আমরা বাধ্য হব ফোর্স অ্যাপ্রাই করতে। মনে রাখিস তোরা।

প্রশাসনের কেউ-বিশ্বুরা চলে যেতেই গোটা ধর্মতলা চত্বর ব্লাক আউট হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য হলেও চোখের নিশানায় কোনো আলোরোখা ছিল না। রাজভবনটাও নিঃশব্দীপ, ভূতুড়ে অন্ধকারে আবৃত। মেয়েরা এমনটিই ভেবেছিল।

একটু আগে নিয়ন আলোয় পুলিশদাঁত দেখেছে। তবু মেয়েরা মরিয়া। চারদিকে বসা মেয়েরা হাত ধরাধরি করে মানববন্ধন করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। বাড়ি থেকে আনা খাবার তারা ভাগাভাগি করে খেল। ধূসর জ্যোৎস্নায় এক একজন সামান্য নারী যেন হাজার কণ্ঠ কাহিনির কণ্ঠক। তারা হাজার রাত ধরে বলে যেতে চায় তাদের দুখে গীথা। সবাই গান ধরল। হাজার কণ্ঠের গান। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নয়। গানের সুর তাগে ছোট ছোট দলে বিভক্ত মেয়েরা। কেউ গান গাইল স্বজন হারানোর গান। বিয়ে, জন্ম, মৃত্যুর গান। সুর আছে সুর নেই। সুর বেসুরের এলোমেলো কাটাকাটিতে তৈরি হল শব্দের মহাকালাজ। একটি শব্দচিত্র। গৃহকর্মীদের ছত্রখান করার জন্য যারা অন্ত্রে শান দিচ্ছিল তারা এমনটি আপে কখনও শোনেনি। উপস্থিত পুলিশ শব্দকোলাজ শুনে ভড়কে গেল। তারা বেয়নেট ধরে ছির হয়ে রইল সারারাত। যেন মৃত সৈনিকের প্রতি শ্রদ্ধারত সৈনিক। সৈনিকের অসংখ্য মূর্তিতে ছেয়ে গেছে ধর্মতলা চত্বরের আনাচকানাচ। আর মেয়েরা মাতঙ্গিনীর মতো একবঙ্গা-পিছাবোনি।

যে মহিলা শেষ রাতে বলতে উঠল — কেউ তার নাম জিজ্ঞেস করেনি। অপরাধ সে করেনি তবু তার মুখ লুকিয়ে বেড়াতে হয় প্রতিনিয়ত। পাথর মূর্তির মতো সেই প্রৌঢ়া বলল—আমার কথা কেউ কোনেদিন শোনেতে চায় নাই। মুই ছিলাম এক শরণার্থী ঘরের মাইয়া। ওপার থাইক্যা খ্যাদা খাইয়া আইছিলাম মোরা। গরিব রিফিউজিগো আর কোথায় ঠাই জোটে? স্টেশন, ট্রেন লাইনের ধার, খাল-নর্দমার পাড়ে। যেমন তোমরা দেখ সবাই। আমার মা বাবুগো বাড়িতে বাসন মাজত। সাথে সাথে গিয়া মুইও হাত লাগাইতাম। একদিন গিল্লি কইল — লক্ষ্মীর মা, মেয়ে ভাগর হচ্ছে। রাস্তাঘাটে তোমরা থাকো, খারাপ লোকের অভাব নাই। মেয়েকে আমার বাড়িতে রাখো, আমাদের হাতে হাতে একটু কাজ করবে আর পড়াশুনা করবে। মা রাজি হয়ে গেল। সব মা-ই চায় মাইয়ারে যেন শিয়াল কুন্ডায় না খুবপায়। মিথ্যা কথা কমু না চৌধুরীবাবুর বাড়িতে পোথম পোথম ভালই লাগত। কত ভাল-মন্দ খাবার। আমার মা বাবার তো নুন আনতে পাষ্টা ফুরাইত। সেখানে বাবুর বাড়ি রোজ কত কত সুখাদু খাবার ফেলা যায়। চৌধুরী গিল্লি বাড়িতে একটু আধটু পড়াইত। আমার তখন বয়স পনেরো ষোলো হবে। গিল্লি কইত—ভাই-র কাছে থেকে তো মাঝে মাঝে পড়াশুনা দেখিয়ে নিতে পারিস।

বাবুর পোলারে ভাই ডাকতাম। ভাই-র খুব উৎসাহ ছিল। আমার থেকে দু-এক বছরের ছোট হলেও চেহারায়া বনেদি ভাব, লম্বা চওড়া। একদিন কেউ বাড়ি ছিল না। বাবুর পোলা আমাকে পড়াতে ডাকল তার ঘরে। পড়ানোর নাম করে সেদিন বাবুর পোলা আমার ভোদা ফলাফলা করইয়া দিল। বাড়ি ফিরে গিল্লি দেখেই বুঝতে পেরেছিল। প্রতিকার তো দূরের কথা, ওরা আমাকে গৃহবন্দি কইয়া ফ্যালাইল। এয়ার পরের ঘটনা শুনে তোমাগো কান্না পইয়া যাবে। এয়ার কয়দিন পর মালকিন তার সুপুতুরকে নিয়া সকালে কোথায় বেরিয়ে গেল। বাড়িতে রইলাম আমি আর চৌধুরীবাবু। ঘরের মধ্যে আমি যেন জড়সড়ো গুটিপোকা। চৌধুরীবাবু এল আমার ঘরে। কোনো ভনিতা না করে আমাকে আবার রেপের উপর রেপ করল একবার, দু'বার...। পোলার অত্যাচারের ছিন্নভিন্ন যোনি বাপ আবার ক্ষুধার্ত রাফসের মতো ছিড়ে খেল। তারপর নেশায় রক্তজবা চোখ মোরে কইল—এখনই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, নইলে হেঁশেলে চালাকাঠের কয়লা বানিয়ে দেব। আমি রক্তভেজা হৃদয়ে বাবা মায়ের সাথে থানায় গিয়েছিলাম। ডিউটি অফিসার খেঁকিয়ে উঠেছিল—কি চৌধুরীবাবুর নামে নিন্দা? এই শালা উড়ো ফেউ, তোর সতী মাইয়ারে ধানায় রেখে যা, চেখে দেখি, কতটা গল্পো ফেঁদেছিস। তারপর না হয় কেস করার কথা ভাবব। বুকের মধ্যে একটা পাথর চেপে বসেছে। আমি লক্ষ্মী, বাবুদের বাড়িতে ধর্মিতা এক নারী। তবু বাবু লেখকেরা মায়ার গল্পো ফাঁদবে কিন্তু কে লিখবে আমার কাহিনি?

সূর্য ওঠার আগেই ধর্মতলা চত্বর খালি হয়ে গেল। পুলিশ-আধা সামরিক বাহিনীর দখল নিয়েছে গোটা এলাকা। পুলিশ খানিকটা মানবিক মুখ দেখাল। মাইকে ওয়ানিং দিল—এই সমাবেশ বে-আইনি। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে বল প্রয়োগ করা হবে। যারা ব্যক্তির সাথে লড়তে পারে না তারা রাষ্ট্রের সাথে লড়ার দুঃসাহস দেখাল না, তারা জানে অক্ষমের ক্ষমতা দেখিয়ে লাভ নেই। আইনের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র দাঁত খিঁচাবে। শেকলি বলল—মা-বোনেরা চলো আমরা ধর্মতলা ছেড়ে দিই। তোমরা তিনদিন ধরে প্রায় নাওয়া-খাওয়া করনি, পায়খানা পেছাপ্রায় বন্ধ। আমরা ক্লান্ত কিন্তু আমাদের কথা ওদের ঘরে পৌছাতে পেরেছি। এই শহরে কার্ফু ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত চাইলে আমরা রাজপথ ধরেই হাঁটিতে পারি, লংমার্চের মতো। আমাদের দুঃখের

সরণী ধরে হাঁটবো আমরা।

দুই

পথের মানুষ পথেই নামল। তাদের আশ্রয়হীন হাজার বছরের হাঁটা। দীর্ঘ পদযাত্রা। শুরু নেই শেষ নেই। বানার নেই, পোস্টার নেই, ফেস্টুন নেই। মানুষগুলোর হেঁটে যাওয়া মিছিল লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে। কিন্তু তাদের মাথাব্যথা নেই বাবুরা চ্যানেলে কি দেখল - কি দেখাল। তারা জারিত হচ্ছে নিজেদের দুঃখ কথায়। সন্ধ্যা মাসির চুলগুলো উপড়ে আসতে চাইছে। তার ক্ষমতা নেই মুখে প্রকাশ করার। মাথার কোষ রক্তাক্ত হচ্ছে। তার একমাত্র ছেলে মারা গেল কাজের বাড়ির দিদির দাক্ষিণ্যের চোটে। প্রতিদিন কিছু না কিছু খেতে নিতে ছেলেটাকে। খাবার থেকে উঠত গরম ধোঁয়া, সেই খাবার যে প্রাণ নিয়ে নিতে পারে কে জানত? একদিন খাবার দিয়ে বলেছিল—সন্ধ্যা, মাংস-ভাতটা ছেলেকে দিস। বাবুদের দেওয়া গরম ভাত খেয়ে ছেলেটা ছটফট করতে করতে কাঠ হয়ে গেল। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিল—স্ট্রং ফুট পরজনিং হয়েছে। সন্ধ্যা বাবুদের গরম ভাত বড় ভয় পায় আজকাল। আর মহিলাওভেন যন্ত্রটাকে—ওটা পচা খাবার গরম করার কারখানা। গরিব মারার কারখানা। বিনিময়ে বেশি কাজ করিয়ে নেওয়ার ভনিতা।

সপ্নিনেরেখার মতো কাজের মাসিদের লংমার্চ। ডিস্ট্রিয়ারার পাশ দিয়ে কলিঘাট, বিজন সেতু থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার দিকে হেঁটে যাচ্ছে জনশ্রোত। শহরের ছোট বড় পার্কগুলি অবরুদ্ধ। পুলিশের আশঙ্কা আবার কোনো খোলা জায়গায় অবস্থান নিতে পারে এই অবাঞ্ছিত লোকগুলি। লোকগুলি অহিংস। তবু পুলিশ-শাসক নেতাদের মনে চোরা ভয়। তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা, একটা বৃদ্ধলোক উদ্ভাস্তের মতো ছুটে ছুটে এসে লংমার্চের মুখ আগলে দাঁড়াল—শোনো, শোনো মা বোনেরা। মিছিলকে না দাঁড়িয়ে উপায় ছিল না। মিছিল স্বাভাবিক গতিতে চললে বৃদ্ধকে মারিয়ে যেতে হত। তারা সংযত। কিন্তু কে এই লোকটি? কেউ জানে না। হতে পারে সে প্রাক্তন আমলা, প্রাক্তন বিচারপতি, পুলিশ কিংবা স্বাক্ষরী বা নিতান্তই কোনো স্কুল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক।

লোকটি বলল—তোমরা শোনো। যদি আগে স্বীকার করতাম তবে বলা যেতে পারত বিবেকের টানে এসেছি। বউ-র রুদ্রমূর্তি আমাকে বাধ্য করেছে এখানে আসতে। যেভাবেই হোক বিবেকের দরজা একটু হলেও করে খুলছে। বেশ কয়েক বছর আগে আমার বাড়ির কাজের ছেলেটিকে আমি জেল খাটিয়েছিলাম। চুরির অপবাদে। বহুদিন আমার বাড়ি থাকত। ছোট একটা শিশু আমাদের বাড়ি এসেছিল পেটের জ্বালায়। প্রথম প্রথম একটা অপত্যস্নেহ গড়ে ওঠেছিল। ছেলেটির নাম ছিল মধু। ছেলেটির কোনো চাহিদা ছিল না। পাখির মতো উড়তে উড়তে কাজ করত। মধু নাতির বয়সিই হবে। তবু আমরা ওর শ্রম উপভোগ করতাম। সামান্য বেতনের বিনিময়ে সারাদিনের পরিশ্রম। মধুর মা আমাকে বলেছিল—জ্যেষ্ঠ-ওর টাকা ক'টা আমরা বাড়ি নিলে খেয়ে ফেলব। আপনার কাছে জমা থাক। ওর ভবিষ্যৎ যদি কিছু একটা করে দিতে পারেন। মধুর বয়স তখন আঠের উনিশ হবে, একদিন বলল—দাদু আমার টাকা ক'টা দাও। ছোটখাটো একটা ব্যবসা করি। মা আর কতদিন অন্যের বাড়ি কাজ করবে। মধুর স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা আমাকে হতবাক করেছিল। মধুদের বশ্যতাই আমাদের সম্পদ। হিসাব করে দেখলাম দশ বছর ধরে মধুর বেশ কয়েক হাজার টাকা জমেছে আমার কাছে। সুদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। মধু অবশ্য সুদ চায়ওনি। একলপ্তে অতগুলো টাকা আর সস্তার শ্রম চলে যাওয়ার আশঙ্কায় আমার মাথায় খুন চেপে গেল। বিকালে থানায় মধুর নামে চুরির কেস ফুকে এলাম। যার ধন চুরি করলাম, তাকে বানালাম চোর। মধু এখন চোর ছাড়াই একজন ভাজাচোরা লোক। আসলে আমরা যারা পুকুর চুরি করি তাদের কাছে ছোটখাটো চুরি তো নসি। বৃদ্ধ একটু ধামল। হাঁপিয়ে গেছে।

—মায়েরা, আমরা সারাজীবন তোমাদের নামে এমন অসংখ্য গল্প রটিয়ে দিই। এটা সস্তার শ্রম কাজায় রাখার একটা পদ্ধতি। আমরা কি চাই আমেরিকার মতো কাজের মাসিরা গাড়িতে করে বাসন মার্জতে আসবে? আমরা কি চাই তোমরা স্বাস্থ্যবিমা, পি.এফ. পাও? খুব বেশি হলে বিদেশে কর্মরত ছেলেমেয়ের জন্য দেশি সস্তার চাকর-বাকর করে তোমাদের পাঠাই। আর গর্বিত হই। এই বেলা আমরা বহুপুত্র্য ধরেই করে আসছি। বাড়ি থেকে হয়ত বাধ্য হয়েই এখানে এসেছি তবু বিবেকের দায় অস্বীকার করতে পারছি না। মা-বোনেরা, আমার প্রায়শ্চিত্ত করার অধিকার নেই। তবু তোমাদের কাছে একটা মিনতি—আমাকে তোমাদের সাথে

এই লংমাটে একটু হাঁটতে দাও।

জনশ্রোত আবার হাঁটতে শুরু করল। বৃদ্ধর পায়ে গতির সাথে তাল মিলানোর তাড়া। তার মনে তিরতির করে বইছে দক্ষিণা বাতাস—একটু ভালর জন্য হাঁটা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দু-চার বাড়ি কাজের লোকদের বন্দি করে রেখেছিল, তারাও জানলার ফাঁক ফাঁকির গলে এসেছে। মিশে যাচ্ছে মাসিদের হোতে। এটা কোনো সাম্রাজ্যবিরোধী মিছিল নয়, বা লৌহপুরুষের দীর্ঘতম মূর্তি গড়ার অঙ্গীকার যাত্রা নয়। তারা হেঁটে যাচ্ছে তাদের জীবনের তাগিদে। জনশ্রোত থমকে গেল শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে। মানুষে মানুষে গ্রায় খিল লেগে গেছে। পাঁচমাথায় আগে থেকে জড়ো হয়েছে অনেক স্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে। তারা ধরে এনেছে অনেক এমন গল্পের লেখকদের। লেখকরা কৈদেকেটে একশা। তারা অতীতে পাতার পর পাতা ভরিয়েছে কাজের মাসিদের অপখতিয়ান লিখে। প্রথমে তারা ভয় পেল, পরে নিরীহ নর-নারীদের দেখে প্রাণে ভরসা জাগল। এই প্রথম তাদের নাকে মাসিদের কাপড়-চোপড়ের ভোদকা গন্ধ লাগল না। হঠাৎ একটি দামাল ছেলে চিৎকার করে উঠল—আরে এই তো ‘মায়ার খেলা’র লেখক আপনাদের মিছিলে লুকিয়ে হাঁটছে। আমরা ওর কঁসি চাই। সবার নজর ঘুরে গেল সেই লোকটির দিকে—আরে এ তো সেই বউ-র তাড়া খাওয়া বুড়ো। লোকটা যে এত কথা বলল? সেই ছেলেটি আবার বলল—মা বোনেরা, ওর ভালমানুষিতে ভুলবেন না। লোকটা কলমটি। বুদ্ধি বেচে যায়। একটা মুখোশ পাণ্টানোর মাঝে খানিক আসল মুখ বেরিয়েছিল। সেটুকু বিবেক। মুখোশ পরলে আবার ঢাকা পড়ে যাবে সেই বিবেকটুকুও। আমরা ওর বিচার চাই।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ভেসে এল দৃঢ়স্বর—আমাদের এখন আর ব্যক্তি লেখককে নিয়ে কিছু করার নেই। সামনে লড়াই গোটা জীবনের।

—কে, কে আপনি? শেফালি?

সূভাষের মূর্তি প্রদক্ষিণরত হাজার কণ্ঠ একসাথে বলে উঠল—হ্যাঁ, আমি শেফালি। আমরা শেফালি। আমরা আজ রক্ত দিতে এসেছি।

তাদের কথা শেষ হতে না হতেই নড়ে উঠল সূভাষের তেজীঘোড়াটা। চার জোড়া... অটো জোড়া... হাজার... লক্ষ জোড়া অশ্বখরের শব্দ টগবগ টগবগ করে আছড়ে পড়ল শহরের প্রাচীন পাঁজরে। কলকাতার গৃহকর্মীরা বদলে গেল মহাযুদ্ধের ঘোড়-সওয়ারিতে। একঝগা ঘোড়ায় ছুটছে তারা—ঘরে ফেরার ডাক নেই। সামনে উড়ে গেল অসংখ্য তীর। দুঃখভেদের নিশানায়। □

বিভেদের চর

গৌতম বিশ্বাস

শান দাও অস্ত্রে, পণ কর ভাই

ভাইয়ের রক্তে, রক্ত-স্নান করা চাই।।

শব্দটা এখন প্রায়শ দেখি। মশলা নিঃশ্বাসের ফাঁকে প্রায়শ শুনি।

আই এস আই সারা অর্থে পাকিস্তানী চর।

পাকিস্তান মানে একটা দেশ নয়, এক রাশ ঘৃণা

কনা ভর্তি বিদ্বেষ; পাকিস্তান মানেই শত্রু

এদেশের প্রতিটা শিশু জন্মের সাথে সাথে জেনে যায়

রূপকথার যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় জেনে যায় পাকিস্তান মানে শত্রু

এদেশের প্রতিটা মানুষের বোধে একটু একটু করে সঞ্চারিত

সত্য জেগে থাকে পাকিস্তান মানেই শত্রু

পাকিস্তানের প্রতিটা শিশু শত্রু

পাকিস্তানের প্রতিটা নাগরিক শত্রু

পাকিস্তানের জল-জলা-পাখ-পাখালী—শত্রু শত্রু।

আমরা জানি কল্লনার রাশ টেনেও জানি আরেক সত্য

ভারতবর্ষের প্রতিটা শিশুও শত্রু

প্রতিটা মানুষ, জল-জলা, পাখ-পাখালী শত্রু

ভারতের আসমুদ্র হিমাচল শত্রু—শত্রু

ঠিক আমাদের মত, আমাদের দেখানো চোখের মত, ওদের চোখে।

আমরা প্রতিবেশী, আমার ভাই আমার বোন আমার রক্তের ধারা

আজ কলুষিত সংক্রমণিত ক্ষমতার জীবানুবাহী মশকদের কাছে।

পাকিস্তান মানে শত্রু পাকিস্তানী চর—মহাশত্রু

আমাদের সংক্রমণিত ধারায় আরো মিশেল, প্রতিনিয়ত মিশেলের ধারা

আই এস আই, পাকিস্তানী চর।

রায়গঞ্জে একজন পাকিস্তানী চর ধৃত, পেশায় শিক্ষক, ধর্মে মুসলমান

শিলিওড়িতে পাঁচজন আই এস আই, উর্দুতে কথা বলে, ধর্মে মুসলমান
হুগলিতে ইমাম ধৃত, পাকিস্তানী চর, ধর্মে মুসলমান
মুশীদাবাদ সীমান্তে পনের জন অনুপ্রবেশকারী অটক, ধর্মে মুসলমান।
এরা সব আই এস আই, এরা সবাই মুসলমান
অর্থাৎ মুসলমান মানেই পাকিস্তানী চর

পাকিস্তান মানে শত্রু
মুসলমান মানেই শত্রু।

সহজ অংক, সরল অংক।

এটাই সত্য, কারণ প্রশাসন বলছে

এটাই সত্য, কারণ প্রচার যন্ত্র বলছে

টিভি বলছে, রেডিও বলছে, কাগজ বলছে, নেতা বলছে

বলছে—প্রস্তুত হও, আগুন জ্বালাবার জন্যে প্রস্তুত হও

শিশু সহ বিদেশি মিশনারী খ্রিস্টানকে যেমন জ্যাস্ত পোড়ানো হয়েছে
প্রস্তুত হও পোড়াবার জন্যে, পুড়বার জন্যে।

পাকিস্তানী চর, আই এস আই

মুসলমান ভিন্ন আর কেহ নাই।

বুদ্ধিমানেরা বেশি কথা বলে না

আমাদের সরকার, ধর্মে সুড়সুড়ি দেয়া সরকারও বেশি কথা বলে না।

সরকার বলে না—মুসলমানেরা শত্রু, বলে আই এস আই শত্রু

যতজন আই এস আই-য়ের গল্প শোনায় সবাই মুসলমান।

সরকার বুদ্ধিমান তাই আর বলে না,

বাকিটা বোঝার দায় আপনার আমার।

সবকাল জগন আমবা সাধারণরা ছোট বক্তির ফাঁদে পড়বই

নিদেনপক্ষে একটা মধ্যবস্থা;

আমরা শুনিছি, খবর শত হস্তে বিকশিত হচ্ছে

চর সন্দেহে ধৃত, চর ধৃত—কিন্তু তারপর?

কি হলো চরদের? অভিযোগ প্রমানিত হলো?

কেউ কি শাস্তি পেল? কেউ কি ছাড়া পেল?

প্রশ্ন আছে উত্তর নেই

কাগজে নেই টিভিতে নেই বেতারে নেই নেতৃত্বে নেই

উদ্বেজনীর শুরু আছে শেষ নেই

সুপারিকল্পিতভাবে জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস আছে

দাবানল নিভাবার কোন ব্যবস্থা নেই।

মানুষ জানে দেহ থাকলে কামনা থাকে

মানুষ জানে দেশ থাকলে চর থাকে

আমেরিকার আছে রাশিয়ার আছে ব্রিটিশের আছে

প্রতিবেশী প্রতিটা দেশের আছে, ভারতবর্ষের আছে।

চরের কোন জাত থাকে না, ধর্ম থাকে না

চর হিন্দু হয় না, মুসলমান হয় না

বৌদ্ধ হয় না, খ্রিস্টান হয় না

আই এস আই-য়েরও ধর্ম থাকতে পারে না

সব দেশে সব পরিস্থিতিতেই বিভীষণরা থাকে, থাকেই।

সহস্র বর্ষে মানুষ এখন শকুনের মত

মৃতদেহ খোঁজে, ভাঙাড়ে অদৃশ্য পাজরের হাড়ে বোনে শীতলপাটি,

ভাঙাড়ে অদৃশ্য পাজরের হাড়ে বোনে শীতলপাটি,

